প্রথম ভারতীয় এটর্নী পরিবার
ও
চার শতকের অকাল বোধন

বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ি
পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা

মুখবন্ধ

দুর্গাপূজো ঘিরে বাঙালীর যে উন্মাদনা তা আজও অমলিন। দুর্গাপূজো আজ আর বনেদি বাড়ীর চোহদ্দিতে আবদ্ধ নেই, ছড়িয়ে পড়েছে বারোয়ারী পূজোর মাধ্যমে জনগণ এর মধ্যে। এইটা এমনই এক উৎসব যা জাত ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ যোগদান করে। তার ফল স্বরূপ এই unesco -র স্বীকৃতি।

বনেদি বাড়ীর পূজো আজ যে কটা বাড়ীতে উৎযাপিত হয় তাদের মধ্যে দুটি আমাদের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের। সময়ের ধারার সাথে বইতে বইতে এই সাবেকি পূজোর অনেক পরিবর্ত্তনের সাক্ষী আমরা। তাই সেই সময়কার আমাদের বাড়ীর পূজো কেমন ছিলো সেই নিয়ে গাঁথা এই স্মরণিকা।

বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীর এই পূজোর একশ বৎসরের স্মরণিকা প্রকাশ পায় ১৯৮৯ সালে; তাতে বহু আগের পূজোর স্মৃতি বহন করেছিলো। এই ১২৫ বৎসরের স্মরণিকা প্রকাশ সময়কাল ছিলো ২০১৪ যা প্রকাশ পেলো ২০২৩ এ।

এই স্মরণিকায় উল্লিখিত হয়েছে সামগ্রিকভাবে "বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের" কলকাতায় আগমন ও অকাল বোধনের আদি থেকে অদ্যবধি আয়োজনের কিয়দংশ।

সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়

বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

আমার পূজোর স্মৃতি	সলিল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫
মনে পড়ে সেই সব দিন	রমা বন্দ্যোপাধ্যায়	৮
তিন জমিদারের কড়চা	সমীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১০
আমার মনের কোনের বাইরে....	মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়	১২
বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ীর অন্দরমহল	স্নিগ্ধা চক্রবর্তী	১৫
আমাদের বাড়ীর দুর্গাপূজো	সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	২০
দুর্গাপুজোর স্মৃতি এখনও খুব মনে পড়ে	আভা বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪
বাড়ির পূজা ও আমি	সুবীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২৭
কলা বৌ	সুমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৪
গৃহবধূর চোখে ১২৫ বছরের দুর্গাপূজো	সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৬
বিনোদ বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়	সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৮
আমার ছেলেবেলা	অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৯
স্মৃতি থেকে	প্রবাল মুখোপাধ্যায়	৪৩
The Legend lives on....	মিনাক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৭
আমার বাপের বাড়ীর পূজো	সোমজিতা মুখোপাধ্যায়	৪৮
নব আনন্দে জাগো...	মোহিনী বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৯
মামার বাড়ির দুর্গাপূজো	রাজসী মুখোপাধ্যায়	৫০
মনের কথা	সোহিনী বন্দ্যোপাধ্যায়	৫১
বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার ও তার দুর্গাপূজোর ইতিহাস	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়	৫২
কপিনৃত্য না ..... ! !	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৬২
প্রথম বাঙালি অ্যাটর্নি	চিত্র গুপ্ত	৬৬
ইনকরপোরেটেড ল সোসাইটি	চিত্র গুপ্ত	৬৯
পটুয়াটোলা লেন বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের বংশ তালিকা		
শত বর্ষের স্মরণীকা পত্রিকা		

পটুয়াটোলা লেন বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের বংশ তালিকা

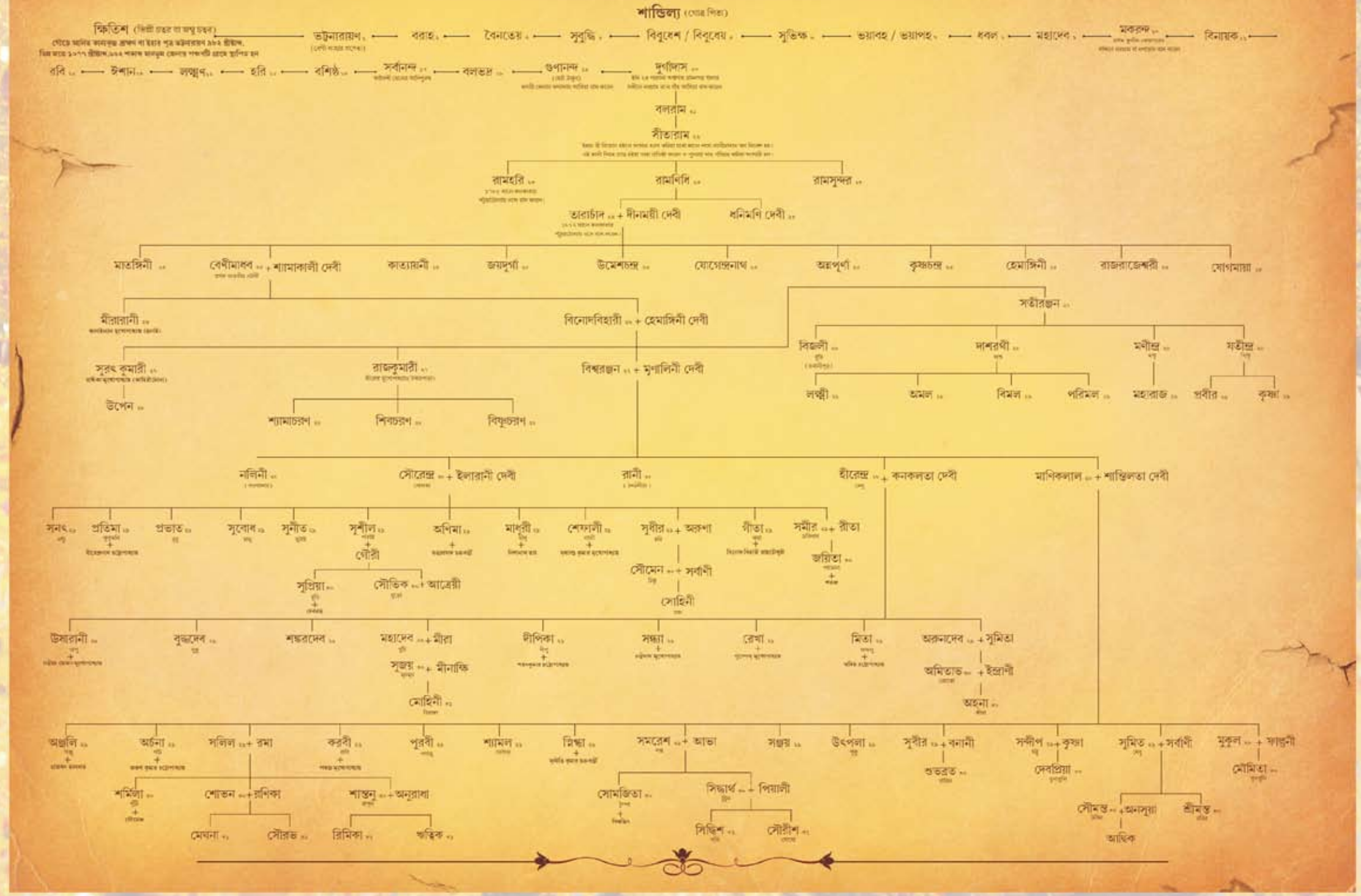

আমার পূজোর স্মৃতি

সলিল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যানার্জি পরিবারের নবীন সদস্য হিসাবে এই পৃথিবীতে আমার আগমন ঘটে ১৯৩২ সালে অর্থাৎ এই বাড়ীর প্রতিষ্ঠার বিয়াল্লিশ বছর পরে। বিশ্বরঞ্জনের মৃত্যুর পর এই বিশাল সম্পত্তির অংশীদারিত্ব নিয়ে পার্টিশনের মামলা সুরু হয়। দশ বছর পরে ১৯৩৪ সালে ব্যানার্জি পরিবারের বিশাল সম্পত্তি দুটি পরিবারের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়।

হরিশ মুখার্জি রোডে বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করেঁসতীরঞ্জনের বংশধরেরা পটুয়াটোলা লেনের বাড়ী ছেড়ে নতুন বাড়ীতে চলে যায়। সম্ভবতঃ ঁসতীরঞ্জন সেই সময় জীবিত ছিলেন না।

নতুন বাড়ীতে মার্বেল পাথরের বিশাল পূজামণ্ডপ পুরনো বাড়ীর অনুকরণে নির্মাণ হলেও সেখানে কোনদিন দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান হয়নি। সম্ভবতঃ ঁসতীরঞ্জনের মৃত্যুর কারণে।

নবগ্রামের ব্যানার্জি পরিবার প্রথমে ৫৪ নম্বর পটুয়াটোলা লেনে বসবাস শুরু করে প্রথম সেখানে দুর্গাপূজার আয়োজন করে। দুইশত বছরেরও আগের সেই পূজা এখনও নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়।

১৮৯০ সালে গৃহ নির্মানের পর এখানে প্রথম বছর বিশাল আড়ম্বরের সঙ্গে দুর্গাপূজার আয়োজন হয়। বিশ্বরঞ্জন এবং সতীরঞ্জন সেই পূজার উদ্যোক্তা ছিলেন। একটি স্মরণীয় ঘটনার কথা এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্যযোগ্য যে, প্রথম বছরের পূজার পুরোহিত মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর নয় বছর বয়সের পুত্র ঁনারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় আসেন। পরবর্তী সত্তর বছরেরও অধিককাল তিনি এই বাড়ীর পূজা এবং অন্যান্য শুভকার্যে অংশগ্রহণ করেন। বিশ্বরঞ্জনের বিবাহের পর এ বাড়ীর বধু হিসাবে মৃণালিনী দেবীর আগমন ঘটে। ধীরে ধীরে তিনি সংসার পরিচালনার সংগে সংগে ধর্মীয় ব্যাপারে নিজেকে তৈরী করে নেন এবং বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দেন। ১৯৫৪ সালে তার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তার সুদক্ষ পরিচালনা এবং সবকিছু তীক্ষ্ণ ভাবে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা আজও আমার স্মৃতিকে প্রভাবিত করে।

আমার শৈশব স্মৃতিতে যে কথাগুলি মনে পড়ে, তার মধ্যে এ বাড়ীর দুর্গাপূজার আড়ম্বর এবং জাঁকজমক এখনও চিরভাস্বর হয়ে রয়েছে। স্কুলে পূজার ছুটির আগে থেকেই বাড়ীতে প্রতিমা গড়ার আয়োজন শুরু হয়ে যেত। সময় পেলেই আমরা, বালকবৃন্দ মহা উৎসাহে তাদের শিল্পকর্ম মনোযোগ দিয়ে দেখতুম। আস্তে আস্তে পূজার দিনগুলো যত এগিয়ে আসত, ততই দিনে প্রতিমা পূর্ণরূপ ধারণ করত। আমাদের শিশুচিত্ত কল্পনায় আগামী পূজা উৎসবের আনন্দে ভরে উঠত।

আসল পূজা সুরু হোত দেবীপক্ষের মহালয়ার পরদিন থেকে। তখন থেকেই বাড়ীতে অতিথি অভ্যাগতদের আগমনে পূজার সূচনা হত। বাড়ীর মেয়েদের বাড়ীর পূজায় সীমাহীন উৎসাহ থাকলেও পারিবারিক বাধ্যবাধকতা কারণে তাদের উপস্থিতি নিয়ন্ত্রিত হত। পূজার দিনগুলোর জাঁকজমক এবং আনন্দ আজও আমার মনে অম্লান রয়েছে। সঙ্গীত প্রেমিক মেজজ্যাঠামশায় প্রতিদিন বাড়ীতে বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞদের নিয়ে দিনভর উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর বসাতেন। প্রতিদিন বাড়ীতে পাঁচশো জনের ভূরিভোজের দুবেলা আয়োজন থাকত। বাড়ীতে ভিয়ান বসিয়ে মিষ্টান্নের ভাণ্ডার তৈয়ারী হত।

কোনও সুখ চিরস্থায়ী হয় না। এই বাড়ীতে শোকের ছায়া নেমে আসে ১৯৩৯ সালে জ্যাঠাইমার মৃত্যুর পর। ঘটনাচক্রে ব্যানার্জি পরিবারের পতনের সূত্রপাত হয় তারপর থেকে। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। পূর্ব এশিয়ায় জাপান যুদ্ধে ব্রিটিশ পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্রিটিশ সরকার দমদমে আমাদের সব সম্পত্তি দখল করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি সুরু করে।

ব্যানার্জি পরিবারের বাৎসরিক খাদ্য সরবরাহের প্রধান উৎস নষ্ট হওয়ার ফলে পরিবারের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। একমাত্র বাড়ীভাড়ার আয়ের ওপর ব্যানার্জি পরিবার নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। দুর্ভিক্ষ, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং মূল্যবৃদ্ধির কারণে ব্যানার্জি পরিবারের অর্থিক প্রাচুর্য সঙ্কুচিত হতে থাকে। জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায় আমরা সপরিবারে মেজমাসিমার উত্তরপাড়ার বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করি। একমাস পরে আমরা আবার কলিকাতায় ফিরে আসি।

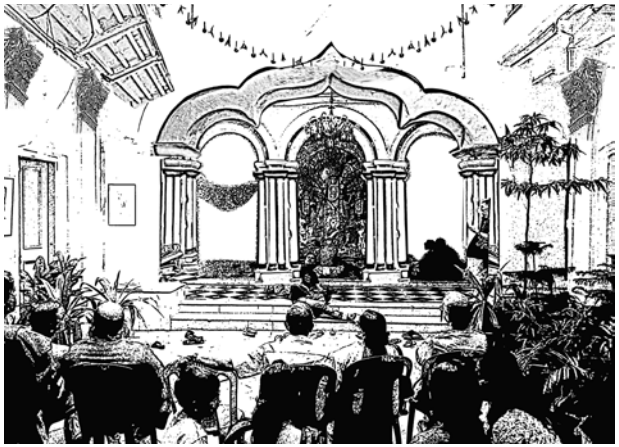

এরপরে কোলকাতায় জাপানী বিমান আক্রমণ শুরু হলে কলিকাতা শহরে মহানিষ্ক্রমণ শুরু হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ কোলকাতা শহর ছেড়ে পালাতে শুরু করে। মেজ জ্যাঠামশায় এবং আমাদের পরিবার কলিকাতা ত্যাগ করে বিষ্ণুপুরে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেখানে ছমাস থাকার পর আমরা ফিরে এলেও, মেজ জ্যাঠামশায় সপরিবারে সেখানে থেকে যান এবং সেখানে অরুনের জন্ম হয়। এরপর সেখানে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে, হৃরোগে মেজ জ্যাঠামশায়ের মৃত্যু হয় এবং মেজ জ্যাঠাইমা সপরিবারে কলিকাতায় ফিরে আসেন।

দুঃসময় কখনও একা আসে না। রাজনৈতিক অস্থিরতা, মূল্যবৃদ্ধি এবং ভাড়ার সীমিত আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যানার্জি পরিবারের আর্থিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হতে থাকে। ভাড়াটের সপক্ষে বিভিন্ন আইন এবং ভাড়াটেদের অসহযোগিতায় ব্যানার্জি পরিবারের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রবল ধর্মপ্রাণতা এবং অদম্য

ইচ্ছাশক্তিতে ব্যানার্জি পরিবারের বাৎসরিক দুর্গোৎসব যথা নিয়মে প্রতিপালিত হতে থাকে। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য দাদা ঁসনৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এর ভক্তি এবং ধর্মনিষ্ঠা এ বাড়ীতে দুর্গাপূজার প্রাণপুরুষ হিসাবে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে প্রতিবছর পূজার অনুষ্ঠান অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এই প্রসংগে আরও দুজনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সেজদা (ঁসুবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) এবং ছোড়দা (ঁসুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়), তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তি পূজার সব আয়োজন সার্থক রক্ষার জন্য সক্রিয় থেকেছে।

১৯৬৭ সালে আমার বোম্বাইতে বদলি হওয়ার ফলে এবং পরের বছর রমার সপরিবারে বোম্বাই যাত্রার পর কয়েকটা বছর আমরা বাড়ীতে পূজার সময় উপস্থিত থাকতে না পারলেও সক্রিয় ভাবে স্থানীয় পূজার সঙ্গে জড়িত থেকেছি। পূজার সময় স্কুলে ছুটি না থাকায় এবং স্কুলে অনুপস্থিতির বিষয়ে কড়ার নিয়ম থাকায় পূজার সময় আমরা কোন বছর বাড়ীর পূজায় উপস্থিত থাকতে পারিনি। কিন্তু প্রতিবছর গ্রীষ্মে স্কুল ছুটির দিনগুলি কলিকাতায় কাটিয়ে গেছি। ফিরে আসার পর প্রতিবছর পূজার দিনগুলি বাড়ীতে কাটিয়ে পূজার আনন্দ উপভোগ করেছি।

আজ পরিণত বয়সের প্রান্ত সীমায় এসে পুরনো দিনে পূজার দিনগুলির কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। কালের প্রবাহে কত পরিবর্তন আমার মনকে প্রভাবিত করেছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী মেনে নিয়েছি।

পটুয়াটোলার বাড়ীতে আজও পুজা হয় কিন্তু আমার পরিচিত পুরনো মানুষগুলোর পরিবর্তে নতুন প্রজন্ম সেই পূজার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছে। একটা পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির পরিবর্তনের রূপ বদলেছে। দাদা আজ আর নেই কিন্তু শৌভিক (বুড়ো) নীতিনিষ্ঠা ভাবে তার ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সুমিত এবং মুনমুন আজ সুষ্ঠুভাবে দুর্গাপূজা পরিচালনা করার ভার গ্রহণ করেছে।

ব্যানার্জি পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের কয়েকজন কৃতী সন্তান কর্মসূত্রে প্রবাসী হলেও পূজার সময় নিয়মিত কোলকাতার পূজাবাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়। যাদের পক্ষে আসা সম্ভব হয়না তাদের মনও বাড়ীর পূজার আনন্দ ভুলতে পারে না। স্থানীয় পূজায় তারাও বিশেষ ভাবে অংশগ্রহণ করে।

আমাদের দিনের কলিকাতা এখন কোলকাতা হয়েছে। পুরনো দিনের পারিবারিক পূজার বদলে এখন বারোয়ারী পূজার জৌলুষ বেড়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সুরু হলেও, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক দূরবস্থা যত বেড়েছে বারোয়ারী পূজার জাঁকজমক তার থেকেও বেশী বেড়েছে। রাজনীতির প্রভাবে দিনে দিনে নেতাদের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সার্বজনীন পূজার শ্রীবৃদ্ধিও ঘটেছে।

অর্থনৈতিক কারণে অনেক পারিবারিক পূজার পরিসমাপ্তি ঘটলেও, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং সহজবোধ্য অন্যান্য নানাকারণে সার্বজনীন পূজার জাঁকজমক এবং জনপ্রিয়তা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। দেখনদারী বাইরের জৌলুষ সেখানে প্রকৃত নিষ্ঠাভরে ভক্তিপূর্ণ পূজার আযোজনকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। তবুও বাড়ীর পারিবারিক পূজাগুলি আজও নিষ্ঠাভরে পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছে।

মনে পড়ে সেই সব দিন

রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুলিখন—সলিল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার পিতামহ ডাক্তার ছিলেন। চিকিৎসক হিসাবে পটুয়াটোলার ব্যানার্জি পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের যোগসূত্র গড়ে ওঠে। আমার বাল্যস্মৃতিতে যে কথা আজও মনে পড়ে, ছোটবেলায় একবার আমায় এ বাড়ীতে নিয়ে আসেন দিদি শাশুড়ি (ঠাকুমা) কুমারী পূজার জন্য।

তার অনেক পরে আমার বারো বছর বয়সে এ বাড়ীতে বধূ হিসাবে আমার পুনরাগমন ঘটে। তারপর থেকে আমার জীবনধারার আমূল পরিবর্তন হয়। এই বাড়ীই আমার নিজের বাড়ী হয়ে ওঠে এ আমার আগের বাড়ীতে কেবলমাত্র একটি ভাই ছিল, এ বাড়ীতে এসে দুই ননদ এবং পাঁচ দেওরকে নিয়ে নতুন জীবন শুরু হল। এর পরে সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বেদনায়, হর্ষে-বিষাদে কখন যে একষট্টি বছর কেটে গেছে তার হিসাব রাখি নি। সকলের প্রীতি-শুভেচ্ছায় মন ভরে উঠেছে।

বিবাহাদি এবং অন্যান্য শুভকর্মে আনন্দ্যোৎসবের দিনগুলি ছাড়া যে বিষয়টি আমার সমস্ত মন জুড়ে রয়েছে, সেটা হোল এ বাড়ীর শারদীয়া দুর্গোৎসব। আমার বিয়ের আগেই ঠাকুমা পৃথিবী থেকে বিদায় দিয়েছেন।

তার অবর্তমানে মেজ-জ্যাঠাইমা নিখুঁতভাবে পূজার সব কাজ পরিচালনা করতেন, সহযোগী হিসাবে মাও সবসময় সঙ্গে থাকতেন। পূজার ব্যাপারে বিশেষ ভাবে মনে পড়ে অনিমাদি ও লালিদির কথা। তারা কঠোর নিয়মবর্ণিতার সঙ্গে কঠোরভাবে সবকিছু শুদ্ধাচারে পালিত হচ্ছে কিনা সেদিকে নজর রাখতেন। সন্ধ্যাদির পূজার ব্যাপারে উৎসাহ আমাকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করত। অন্যরাও পূজায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিতেন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে। আমার বিয়ের পর প্রথম বছর পূজার আগে বাবা শিমূলতলায় সপরিবারে বেড়াতেন যান। কেবল মা ও তাঁর বড় ছেলে পূজার সময় বাড়ীতে থাকেন। ষষ্ঠীর রাতে হঠাৎ মার প্রবল বমি এবং পায়খানা শুরু

হয়। রাতেই বাড়ীতে ডাক্তার এনে চিকিৎসা শুরু করলেও রোগীর অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি ভরসা না দেওয়ায়, সকালেই মেজদাকে শিমূলতলায় পাঠানো হয়, খবর দেওয়ার জন্য। খবর পেয়েই সবাইকে নিয়ে অষ্টমীর দিন তিনি কলিকাতায় ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে মা ভাল হয়ে ওঠায় বাড়ীতে পূজার আনন্দ আরও বেড়ে যায়। যেন মা দুর্গাই দূর্গার দিনে কাছে টেনে আনেন।

পরিশেষে উল্লেখ করতে চাই যে এ বাড়ীতে বধূ হিসাবে আমার প্রথম বছর পূজার সময় প্রতিমাকে বরণ করার সুযোগ ঘটে। আমার মনে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে এ বাড়ীতে শতবার্ষিক পূজার প্রতিমাকে বরণ করার সৌভাগ্যের কথা।

১৯৬৮ সালে বোম্বাইতে বদলি হওয়ায় আমাকেও শর্মিলা এবং শোভনকে নিয়ে সেখানে সেখানে যেতে হয়। কিন্তু পূজার দিনগুলিতে আমার মনে পড়ে থাকত বাড়ীতে। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মত সেখানকার পূজায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করলেও, বাড়ীর পূজার কথা ভেবে কিছুতেই আমার মন ভরতো না।

পূজার সময় বোম্বাইতে আলাদা করে ছুটি থাকত না বলে প্রবাসে থাকার সময় কোনবারই পূজার সময় বাড়ীতে আসতে পারিনি। সেই দুঃখ কোনদিনই ভুলব না।

তবে প্রতিবছর গ্রীষ্মের সময় ছেলেমেয়েদের নিয়ে ছুটির দিনগুলি সবার সঙ্গে মিলে মিশে কাটিয়ে গেছি। পূজার ব্যাপারে আরও যে কথাগুলো মনে পড়ে তার মধ্যে বিশেষ করে বড় ভাসুর দাদার কথা; মহালয়ায় সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুদ্ধাচীরে তার জীবনযা পন।

মেজদা (ভাসুর)

আর ছোড়দার (ভাসুর) কঠোর পরিশ্রমে পূজার দিনগুলোর সমস্ত ব্যবস্থা পরিচালনা। বাড়ীর আর সকলের উৎসাহ ভরে পূজার আনন্দ অনুষ্ঠানে যোগদান আজও মনে পড়ে।

ঁনারায়ণ ভট্টাচার্য মহাশয় সত্তর বছরেরও বেশীকাল এবাড়ীর সব শুভকার্যে পোরাহিত্য করেছেন পরে তার ভাইপো ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনেকদিন পূজা এবং অন্যান্য শুভকার্যে পৌরহিত্য করেন।

বর্তমান প্রজন্মও নিষ্ঠাভরে এ বাড়ীর পূজার ঐতিহ্য বজায় রেখেছে কর্মসূত্রে যারা প্রবাস তারাও পূজার সময় উপস্থিত থাকতে চেষ্টা করে এবং অনিবার্য কারণে উপস্থিত সম্ভব না হতে পারলে, তাদের মন বাড়ীর পূজার স্মৃতিতে ভরে থাকে।

শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি এ বাড়ীতে আসার পর থেকে গত ৬৩ বছর ধরে যে স্নেহ-প্রীতি ও ভালবাসা পেয়েছি সকলের কাছ থেকে তার জন্য নিজেকে পরম সৌভাগ্যবতী বলে মনে করি। আর যতদিন পারি বাড়ীর পূজায় উপস্থিত থাকতে চাই।

তিন জমিদারের কড়চা

সমীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা তখন ভারতের রাজধানী। সুতরাং 'সুপ্রিম কোর্ট' ও কলকাতায় অবস্থিত। এই কোর্টেরও একজন সনামধন্য প্রথম বাঙ্গালী এ্যাটর্নী ছিলেন বেনীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অল্প বয়সে মারা গেলেও কলকাতায় চৌরঙ্গী, ভবানীপুর, পটলডাঙ্গা ও দমদমে প্রচুর সম্পতি করে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর সুযোগ্য পুত্র বিনোদ বিহারী এবং তঁার প্রপুত্রদ্বয় বিশ্বরঞ্জন ও সতীরঞ্জন এই সম্পত্তি বহুল পরিমানে বৃদ্ধি করেছিলেন।

আলোচ্য অংশে আমি কেবল বিশ্বরঞ্জন বাবুর তিন পুত্রের সখ-আহ্লাদের কথাই বলবার চেষ্টা করছি। বড় পুত্র সৌরেন্দ্রমোহন, মেজপুত্র হীরেন্দ্র মোহন এবং কনিষ্ঠ পুত্র মানিকলাল।

সৌরেন্দ্র মোহন বাবু ছিলেন খুব শৌখিন মানুষ। তাঁর হৃদয় ও ছিল বড় কোমল। সম্পত্তি রক্ষার্থে তাঁকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তিনি আবার স্নেহশীল পিতাও ছিলেন। অতিথি আপ্যায়নে তিনি বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন।

হীরেন্দ্রমোহনবাবু ছিলেন একজন সঙ্গীত প্রেমিক। নিজেও একজন সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। তাঁর সময়ে নিয়মিত বৈঠকখানায় সঙ্গীতের আসর বসত। এই অনুষ্ঠানে বহু প্রখ্যাত গাইয়ে বাজিয়ে অংশ গ্রহণ করতেন। তিনি খুব অল্প বয়সে মারা যান। তাঁর সুযোগ্য পুত্র বুদ্ধদেব ও একজন পুরস্কার প্রাপ্ত সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন।

মানিকবাবু ছিলেন একজন ভ্রমণ রসিক। প্রায়ই তিনি সপরিবারে ভ্রমণে বেরতেন, তাঁর প্রধান সখ ছিল মাছধরা, ভাল মাছ ধরতেও পারতেন। প্রায়ই সঙ্গী-সাথী, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে মাছ ধরতে বেরতেন।

এখন আমি এঁদের ফুল, পশু-পাখী, জন্তু-জানোয়ার ও সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ সম্বন্ধে কিছু জানাবার চেষ্টা করছি ঃ

ফুল ঃ 'তিনকর্তাই ছিলেন ভক্ত। তাই দম্‌দমে্‌ 'বেণীভিলায়' যে বাগান বাড়ি ছিল সেখানে কত রকম ফুল ফুটিয়ে ছিলেন। বেড়ার ধারের 'হাসুনাহানা', 'কামিনী', 'বোগেনভিলা', 'মধুমালতি', প্রভৃতি ফুল চারিধার গন্ধে মাতিয়ে রাখত। পুকুরে জলপদ্ম ও শালুক আবার জমিতেও স্থলপদ্ম ফুটে থাকত। বিভিন্ন ঋতুতে বিচিত্র সব ফুলের আবির্ভাব ঘটত। কাঁঠালী, চিনে, কনক ও সর্ণ চাঁপার ফুলের গন্ধ বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ত। জুঁই, বেল, টগর, শিউলী, জবা, গাঁদা প্রভৃতি ও ফুটতো। নানা ধরনের গোলাপ গাছ ছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঈজিহি, পলনিরো, ব্ল্যাকপ্রিন্স ও হোয়াই ভট্টাচার্য। বিদেশী ফুল যথা—মিউটিপলিস, ম্যাগনোলিয়া গ্ল্যান্তিফ্লোরা, সুইচপি প্রভৃতি ফুল দমদম ছাড়াও আমাদের পটুয়াটোলার বাড়ির পিছনে ছোট্ট বাগানেও ফুটতো।

পশু-পাখি ঃ

তিন কর্তারই পশু-পাখি পোষার সখ ছিল। কত রকম পাখি ছিল, তাদের বিচিত্র বর্ণ, বিভিন্ন কণ্ঠস্বর আবার আকার-প্রকারেও ছিল কত বৈচিত্র। এদের মধ্যে আবার কেউ কেউ মানুষের মতো কথা বলত। কাকাতুয়া, ম্যাকাও, লালমোহন এদের মধ্যে কাকাতুয়া কথা বলতে পারত। ময়না ছিল বহুদিনের পুরানো। কেবল বলত 'রাধা কেষ্ট'। বিখ্যাত তবলা বাদক ওস্তাদ কেরামাৎতুল্লা খাঁ একে আরও অনেক কথা শিখিয়ে ছিলেন। পরবর্তীকালে সৌরেন বাবু দুটি ময়না কিনেছিলেন। তাঁরাও অনেক কথা বলত—'গীতা' বলে আমার দিদিকে ডাকত। আমাকে দেখলে বলত সমীর, ভাগ্নীকে বলত মীনাক্ষী চা খাবি, ভাল কাবার, আকাশবাণী, বাপরে-বাপ, কাকে চাই, আরও কত কথা বলত। এছাড়া ছিল বউ-কথা-কও, পাপিয়া, ভীমরাজ, দোয়েল, কোকিল, বদ্রীকা, টিয়া, ডাকপাখি, মুনিয়া, বেনেবউ, হরিয়াল আরও কত রকমের। প্রধানত এই সকল পাখি ছিল সৌরেনবাবুর। হীরেনবাবু ও মানিকবাবুর ও কিছু কিছু পাখি ছিল। হীরেন বাবুর 'বেনীভিলাষ' কালো সোয়ান ও রাজহাঁস ছিল। এরা সারাদিন পুকুরে সাঁতার দিত। পটুয়াটোলায় ছিল সাদা ময়ূর, রঙিন ময়ূর ও ব্রহ্মদেশের ময়ূর। পুকুরে অনেক পাতিহাঁস খেলে বেড়াত। বাড়িতে ছিল অনেক রকমের পায়রা, যথা—সিরাজু, লক্কা, জ্যাকসিন, মক্ষী, গলাফুলো, সার্টিন প্রভৃতি। চতুষ্পদ প্রাণী বলতে ছিল একটি হরিণ। তিনটি ঘোড়া, গরু, কুকুর বেজি ও টাইগার ক্যাট।

গান-বাজনা ঃ

তিন কর্তারই সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ ছিল। তাঁরা প্রত্যেকেই গানও গাইতেন। সৌরেন বাবুর গাওয়া গানগুলির মধ্যে বিশেষ করে মনে পড়ে এই গানগুলি। যথা—'তুমি কাদের কুলের বউ', 'নিমিষেরই দেখা যদি, 'দেখা হবে ছাদ্‌না তলায়', কোন গ্যালিমে গ্যাও শ্যাম' প্রভৃতি।

হীরেনবাবু প্রকৃত একজন গায়ক ছিলেন। তঁর গানগুলির মধ্যে মনে পড়ে, যথা—'মম মধুর মিনতি', 'হে গোবিন্দা হে গোপাল', 'হলুদ গাঁদার ফুল', 'ঝুমরা নাচ নেচে কে এল' ইত্যাদি।

মানিকবাবুও একজন গানের রসিক ছিলেন। তিনি গুণ গুণ করে অনেক গান গাইতেন। তার মধ্যে মনে পড়ে যথা—'আজি ঘুম ঘোরে এলে মনোহর', একহাতে মোর পূজার থালা প্রভৃতি।

আমাদের এই বাড়িতে অনেক জ্ঞানী-গুণী শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে, এবং আজও ঘটছে। এই সকল অনুষ্ঠানে, অংশগ্রহণ করে যাঁরা আমাদের ধন্য করেছেন, তাঁরা হলেন যথাক্রমে—সর্বশ্রী জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, গিরিজাপ্রসন্ন, কেরামাৎতুল্লা খাঁ, অনিল বাগচী, কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, যামিনী গাঙ্গুলী, কাজী নজরুল ইসলাম, শচীনদাশ মতিলাল, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, হীরু গাঙ্গুলী ও বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী ওস্তাদ বাদল খাঁ। এই বাড়ির সন্তান মন্টু ব্যানার্জীর নামও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

আজ দুর্গাপুজোর একশত পঁচিশ বছরে পদার্পণ ঘটল। আগের মতো আচার-অনুষ্ঠান, নিয়মকানুন, মেনে ভক্তিপূর্ণ পরিবেশে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে।

স্বর্গীয় গুরুজনদের প্রণাম জানিয়ে আমার 'তিন জমিদারের কড়চা' এখানেই শেষ করলাম।

আমার মনের কোনের বাইরে.....

মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়

এখন কেউ লেখার কথা বললে আমার গায়ের জ্বর এসে যায়, লেখার সঙ্গে আজ প্রায় চল্লিশ বছর কোন সম্পর্ক নেই। লেখা আবার আমার শ্বশুরবাড়ির দেওয়া নাম।

আমার ডাক নাম সানি। এই নাম শ্বশুর বাড়ীতে খুব সাহেবী ও কেতা দূরস্ত মনে হওয়ায় নাম গেলো বদলে, তাই নামটা নমনীয় কমনীয় করে নামকরণ হলো লেখা। এই নামের পেছনে কারণ আমার হাতে লেখা।

কি লিখবো আজ? আজ একান্ন বছর এই বাড়ীর সঙ্গে একাত্ম। বউ হয়ে এলাম এ বাড়ীতে মনে হয় যেন এই সেদিন। তবে বিয়ের আগে থেকেই দুই পরিবারের যোগসূত্র ছিলো। সে ভাবেই একবার শিশু অবস্থায় আর একবার দশ বছর বয়সে পুজোর সময়ে এ বাড়ীতে এসেছিলাম। বাপের বাড়ী গান-বাজনার বাড়ী। আমার মেজ জ্যাঠামশাই ছিলেন সে কালের বড় ধ্রুপদ গায়ক। বাবা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ছাত্র। আমিও বড় হই গান-বাজনার পরিবেশে, বাবা আমাকে সেতার ধরিয়েছিলেন। ছোট বোনকে গানে দিয়েছিলেন। বাপের বাড়ী ও শ্বশুর বাড়ীর মেলবন্ধন ছিলো এই গান।

এখানে তখন তিন কর্তার আমল। বড় ছিলো পাখী ও পায়রার সখ। ম্যাকাও, কাকাতুয়া আরও কত কি পাখী। হরবোলার মত কথা বলতো। মেজ কর্তা ছিলেন আমার শ্বশুর মশাই, ওনার বাগান ও গান বাজনার সখ ছিলো। বড় বড় ওস্তাদরা আসতেন। বৈঠক খানায় চলতো গানের আসর। এখানে সাদা ময়ূর ২টি, গিনি ময়ূর ১১টি ছিল, হয়তো সেই কারণে "ময়ূরওয়ালা" বাড়ী বলে আজও পরিচিত। আর ছোট কর্ত্তার সখ্ ছিল মাছ ধরা অভিজাত বোনেদী বাগান-বাড়ীর পুকুরে সদলবলে মাছ ধরতে যেতেন বন্ধু বান্ধব নিয়ে। উনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন, প্রেসিডেন্সী কলেজে ছাত্র ছিলেন।

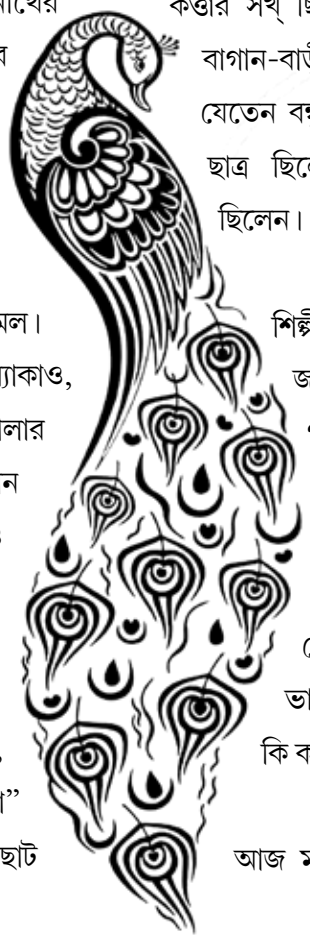

এ বাড়ীর জলসাঘরে সনামধন্য শিল্পীরা আসতেন। আমার মেজ জাঠ্যামশাইও আসতেন গান গাইতেন। পুজোর সময়ে আমার বাপের বাড়ীতে ফিটোন গাড়ী যেত আমাদের আনতে। বাড়ীর সবাই আসতাম। বাড়ীর ছোট বড় কেউই বাদ থাকতো না। আজও ভাবি অতজন এক গাড়ীতে আসতাম কি করে?

মায়ের মুখে শোনা একটা কথা আজ মনে পড়ছে। আমার তখন বছর

২ বয়স। দাদার বয়স তিন বছর। ফিটন গাড়ী এসেছে আমাদের নিয়ে যেতে। গাড়ী যখন আমাদের নিয়ে পটুয়াটোলার বাড়ীর সামনে এসে পৌঁছলো, তখন কোনো কারণে আমার শ্বশুরমশাই সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। গাড়ির থেকে দাদাকে কোলে করে নামালেন, ও আমাকে কোলে নিলেন। বাবা ও মা গাড়ী থেকে নামার পর আমি আর মায়ের কোলে যেতে চাইলাম না। সারাক্ষণ ওনার কোলে কোরে ঘুরলাম। যাবার সময়ে মায়ের কোলে না যাওয়াতে মা জোর করে টেনে নিলেন কোলে। আমি জুড়লাম কান্না। এই পরিস্থিতিতে হাসতে হাসতে উনি বলেছিলেন যে, 'এখন মায়ের সঙ্গে যাও পরে তোমায় বৌ করে আনবো। তখন আর যেতে হবে না।" দীর্ঘ কুড়ি বছর পর এই কথা যে সত্যি হয়ে ফলবে তা কেউ কল্পনা করতে পারেনি। যখন এই বাড়ী থেকে আমার সম্বন্ধ গেলো, তখন আমার মায়ের এই দিনটার কথা মনে পড়ে ছিলো।

বিয়ের পর জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু। বাড়ীতে মেয়ে মানুষ বলতে গুনে ৫ জন। আর পুরুষ মানুষ ছিলেন ১৮ জন। এই বাড়ীতে বিয়ে হয়ে আসে আমার ছোট বেলার বন্ধু "মিনু" বছর পাঁচেক আগে। আমরা দুই "জা" দুই শাশুড়ি ও এক ননদ মিলে আমাদের অন্দরমহল। বাপের বাড়ী প্রাণ উচ্ছল হৈচৈ, সঙ্গীত মুখর পরিবেশ থেকে এসে পড়লাম বনেদী বাড়ীর অন্দর মহলে, যেখানে বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে কোন যোগাযোগ ছিল না, ভেতর বাড়ী থেকে বাইরে বাড়ী আসতে ছিল মানা। জানলার খড়খড়ির ভেতর দিয়ে বাইরের বাড়ি উঁকি দিয়ে দেখা ছিল সে কালের রেওয়াজ অনেকটা চারুতলার মাধবীর মতন। এ ছাড়াও ছিল শাশুড়ীর ও দেওরের কড়া শাসন। ঘোমটা কম দেওয়া বা না দেওয়া ঘিরে উঠতো সমালোচনা ঝড়।'

আমার শাশুড়ী পুরনো পন্থী হয়েও কিছু কিছু ব্যাপারে ছিলেন আধুনিক। তাঁর পড়াশুনার উপর খুব আগ্রহ ছিল। তিনি সেকালে ক্লাস ফাইভ অবধি পড়াশুনা করলেও তার জ্ঞানের কোন খামতি ছিল না। খবরে কাগজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন এমন কি কাগজের ঠোঙাতে কিছু পড়ার থাকলে সেটাও পাট খুলে পড়তেন দেখেছি। তাঁকে আমি যত দেখতাম তত অবাক হতাম। একবার আমার স্বামীকে শখ করে বললাম, যে ছেলে তো এখন বড় হয়ে গেছে এবার আমি আবার পড়বো। তিনি ছিলেন শিবের মতো সদাশিব। তার নামের সঙ্গে চেহারাও ও ব্যবহারের আশ্চর্য মিল ছিল। তিনি বললেন সংসারের সব কাজ সামলে যদি তুমি পড়তে পারো আমার কোন আপত্তি নেই এবার শাশুড়ির কাছে ছাড়পত্র নেবার পালা। আমার পড়ার ইচ্ছে শুনে তিনি শুধু ছাড়পত্রই দিলেন না যথেষ্ট প্রেরণাও যোগালেন। M.A পড়ার সময়ে প্রফেসার আমাদের বাড়ীতে আসতেন। মিত্র স্কুলের হেড মাস্টার বিভাস মিত্র ও আসতেন। পার্ব্বতী চরণ ভট্টাচার্য ছিলেন ভাষাবিদ। প্রগাঢ় পণ্ডিত। "শাশুড়ি মা নিজের হাতে চা করে আনতেন। পার্ব্বতী বাবুর সঙ্গে তিনি কখনও বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র নিয়ে প্রশ্ন তুলতেন ও আগ্রহ ভরে শুনতেন। এই আসরে

ছোট কাকীমা কখনও কখনও আসতেন। আলোচনা সভা যেন সাহিত্য বাসরের রূপ নিত। আমি অবাক হয়ে ভাবতাম ক্লাস ফাইভে পড়াশুনা করা আমার শাশুড়ি মা একজন বাংলা প্রফেসারের সঙ্গে কি ভাবে সহজে সাহিত্য আলোচনা করে যাচ্ছেন।

তিনি পড়াশুনা ভালবাসতেন। তার বাপের বাড়ী সবাই বিদ্যান ছিলেন। তার তিন পুরুষের নামে রাস্তা টালা বীজের কাছে। তিনি মেয়ে না হলে হয়তো বাড়ীর লোকেরা তার পড়াশুনা চালাতেন। (ওনার বাবা জর্জ ছিলেন) আমাকে পড়ানোর পেছনে হয়তো সেই আফশোস কাজ করেছিল, হয়তো তিনি আমার সাফল্যের মধ্যে দিয়ে সেই সাফল্য খুঁজতে চেয়েছিলেন।

আমার বিয়ের পাঁচ বছর পর আমার দেওরের বিয়ে হয়। বালিকা বধূ হয়ে এলো আমার জা সুমিতা। খুব মিষ্টি মেয়ে। দুই বোনের মতো হাসি আনন্দে দিন কাটাতে লাগলাম। ধীরে ধীরে বাড়ীর অন্যান্য ভাসুর দেওরদের বিয়ের

সঙ্গে সঙ্গে পালে আসতে লাগলো নতুন হাওয়া পুরনো পাল গেলো ছিঁড়ে। আধুনিকতা ঢুকে পড়লো। শুরু হলো একা একা টুকিটাকি কিনতে বেরোনো, ছেলেকে স্কুলে দিয়ে আসা, নিয়ে আসা।

পোশাকে আসাকেও এলো পরিবর্ত্তন। ঘোমটা দেওয়াটা টিকে রইল শুধুমাত্র কোন গুরুজন স্থানীয় বাড়ীতে এলে বা বাড়ীর বাইরে বেরুলে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাত কাটা ব্লাউজও ঢুকে পড়লো অন্দর মহলে। সত্তরের দশক নারী স্বাধীনতার প্রতীক বলা যেতে পারে। উপন্যাস থেকে শুরু করে নাটক, কবিতা সিনেমা সবই অকারণ প্রথা কুসংস্কার প্রতিবাদের গদ্য পদ্য ও ছবি। এই সবই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রভাব ফেলেছিলো। শক্তি জুগিয়ে ছিলো মনে। ছেলেকে নিজের মনের মতো করে মানুষ করার উদ্দেশে বাড়ির আপত্তি সত্ত্বেও ছেলেকে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করলাম। সেই সঙ্গে এই নতুন ধারার সূত্রপাত হল। আজ এখন লিখতে বসে এই বংশের ছেলে মেয়েদের কথা মনে করি তখন গর্বে বুক ভরে যায়। বেণীমাধব বাবুর যোগ্য উত্তরসূরী এরা, লক্ষ্মী সরস্বতীর একত্রে বসবাস। আজ এই বাড়ীর ছেলেমেয়েরা সুনামের সঙ্গে পৃথিবীর বড় বড় দেশে ছড়িয়ে আছে। এমন এমন বিষয়ে তাদের গবেষণা যা সভ্যতার নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে। এর থেকে বড় চাওয়া, এই পরিবারের আর কি থাকতে পারে মা দুর্গার কাছে তাই মনের কোনে যে স্মৃতি বয়ে এসেছি এতোদিন ধরে তা আজ বাহিরে এলো। আলো পেলো—হয়তো আলো দিল এক ধূসর সময়কে।

বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ীর অন্দরমহল

স্নিগ্ধা চক্রবর্তী

আজ আমি ৮নং পটুয়াটোলা লেনের ব্যানার্জী বাড়ীর অন্দর মহলের ইতিহাস লিখতে বসেছি যার কিছুটা আমার জানা, কিছুটা শোনা। আগেকার দিনের মানুষরা এখন প্রায় কেউ নেই। কিন্তু ঠাকুমার ছায়াসঙ্গী হিসেবে যেটুকু গল্প শুনেছি সেই ইতিহাসটুকু লিখছি।

তখন ব্যানার্জী বাড়ীর অন্দর মহলের অধীশ্বরী ছিলেন আমাদের ঠাকুমা। মাত্র ৯ বছর বয়সে তাঁর শ্বশুর শ্রদ্ধেয় বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় আড়ীয়াদহের এক গোঁড়া ও সম্পন্ন পরিবার থেকে তাকে জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ করে নিয়ে আসেন। তিনি খুব সুন্দরী ছিলেন। তাঁর নাম ছিলো মৃণালিনী। জমিদার বাড়ীর গৃহিণী হিসাবে তাঁর শ্বশুর মশাই নানা বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলেন। রোজ বিকালে বাড়ীর ফিটন গাড়ীতে চাপিয়ে আদবকায়দা শেখানোর জন্য পার্কষ্ট্রীটে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। কিছু লেখা পড়াও শিখিয়ে ছিলেন।

আমরা দাদুকে দেখিনি। তিনি অল্প বয়সে মারা যান। আমরা দেখেছি ঠাকুমাই নিপুন হাতে এই বিশাল সম্পত্তি সামলেও সমস্ত কর্ত্তব্য সুচারু ভাবে সম্পন্ন করেছেন।

আমরা যখন খুব ছোট তখন দেখেছি ঠাকুমার মা অর্থাৎ বড়মা আমাদের বাড়ীতেই থাকতেন। তখন তার বয়স প্রায় ১০০ বছর। আর ছিলেন ঠাকুমার দুই ভাই ছোটদাদু ও গোঁড়া দাদু। দাদু আমাদের সব ভাই বোনেদেরখুব ভালোবাসতেন। আর ছিলেন ঠাকুমার ননদের ছেলে শিবুকাকা। তিনি একটু পাগলাটে ধরনের ছিলেন। মাতৃহারা হবার পর ঠাকুমাই তাকে নিজের কাছে এনে রাখেন।

অন্দর মহলের কথা লিখতে গেলে বার মহলের কিছু কথা এসেই যায়। দাদু ও কাকা ছাড়াও অতিথি অভ্যাগতের সমাগমে বাড়ীতে সব সময়ই উৎসবে পরিবেশ থাকতো।

এবার আমার আসল গল্পের শুরু। ঠাকুমা ছিলেন তিন পুত্র ও দুই কন্যার জননী। পুত্র কন্যার কল্যাণে নাতি নাতনীর সংখ্যা ছিলো প্রায় ৬০ থেকে ৭০ জন। বড় পিসি নলিনী (নোলু) ও ছোট পিসীর নাম ইন্দিরা (রাঙ্কু)। তাদের দুজনেরই সম্পন্ন জমিদার বাড়ীতে বিয়ে হয়েছিলো। বড় জ্যেঠুর নাম ছিলো সৌরেন্দ্র মোহন (বোঙ্কা)।

এখানে তাঁর কথা একটু লিখি। তিনি আমাদের খুব ভালোবাসতেন। আমরা জ্যোঠিমাকে দেখিনি। দাদা দিদিরাই ছিলো আমাদের পরম আপন জন। জ্যেঠুর ছিলো পাখী পোষার সখ। আমাদের বাড়ীর মস্ত উঠোনে দশ বারোটা ময়ূর ঘুরে বেড়াতো। দোতলার পাথরের দালানে সারি দিয়ে পাখীর খাঁচা টাঙানো থাকতো। কয়েকটা পাখী মানুষের মত কথা বলতো। সকালে পাখীওলা আসতো খাঁচা পরিষ্কার করে

তাদের খাবার দিতো, কেউ খেতো ফড়িং, কেউ ছাতু, পোকা মাকড়, কিমার বল ইত্যাদি। একটা পাখী রেডিওর পাশে থাকতো আর মাঝে মাঝে বলতো "আকাশ বাণী কলকাতা"। ময়ূরের খাবার দিতো দাদা ছোড়দা ও সমীরদা। যখন পিসীরা আসতো তখন ভাই বোনের কোলাহল ও পাখীর কলতানে বাড়ী সরগরম হয়ে উঠতো। জ্যেঠুর সঙ্গে আমরা চিড়িয়াখানা, রেসকোর্সে ঘোড়দৌড় দেখতে যেতাম। সেটাও খুব মজার ব্যাপার ছিলো।

একবার খুব মজার ব্যাপার হলো। আমাদের পিসীর ছেলে কানুদা শিকারে গিয়ে দুটো বাঘের বাচ্ছা এনে হাজির করলো। কেউ কেউ অবশ্য বললো বাঘ নয়, বন বিড়াল। যাই হোক তাদের জন্য বড় খাঁচা এল। প্রথমে তারা দুধ ভাত খেত। একটু বড় হলে মাংসের কিমা দেওয়া হতো। একবার খাবার দেবার সময় রাখালের হাত কামড়ে দিলো তারপর তাদের চিড়িয়াখানায় রেখে আসা হলো।

এবার আসি মেজ জ্যেঠুর কথায়। উনি যখন মারা যান তখন আমি খুব ছোট। কিন্তু তাঁর ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকার বাগান, অর্কিড হাউস, লালমাছের চৌবাচ্ছা, বিশেষ করে ম্যাগলোনিয়া ফুলের গাছটির কথা স্মৃটিপটে রয়ে গেছে। এছাড়া তাঁর গানের খুব শখ ছিলো মাঝে মাঝে বড় ওস্তাদেরা এসে নীচের বৈকখানা ঘরে গানের আসর বসাতেন। এখানে বুদ্ধুদার কথা না বললেই নয়। রাতে পড়াশোনার পর ঠাকুমার কাছে যখন ঘুমাতে যেতাম তখন শুনতাম তার গলায় দরবারী কানাডা, ভীম পলশ্রীর আলাপ। চারদিকের নিঃস্তব্ধতা এক ঐশ্বরিক পরিবেশের সৃষ্টি করতো। এছাড়া আমার দাদা দিদিরাও সুন্দর গান করতো। এই সাঙ্গীতিক পরিবেশে বড় হয়েছে বলেই এখনো সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা ভাইপো ভাইঝিদের মধ্যেও এই সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মেল বন্ধন অটুট।

এবার একটু বাবার কথা বলি। বাবা ছিলেন Presidency এর স্নাতক। অফিস ঘরে বসে এই বৃহৎ সংসারের কাগজ পত্র দেখাশোনা করতেন। বিশাল সম্পত্তি দেখাশোনার ভার তাঁর ওপর ছিল। বাবার বন্ধুরাও সবাই ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। সেই সব গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও আমাদের বাড়ীতে আসতেন বাবার মাছ ধরার সঙ্গী হিসাবে। ভোরবেলা ঘুম ভাঙলে বাবা আমাদের Keats, Byron, Wordsworth-এর কবিতা গীতার শ্লোক, রামায়ণ মহাভারতের গল্প শোনাতেন। মাঝে মাঝে আমরাও বাবার মাছ ধরার সঙ্গী হতাম। অনেক সময় দমদম Airport, New Market এ বেড়াতে নিয়ে যেতেন।

বড় জ্যেঠিমাকে আমরা দেখিনি। তাঁর নাম ছিল ইলা। মেজ জ্যেঠিমাকে দেখেছি অল্প বয়সে বিধবা হওয়ার জন্য ছোট ছোট ভাই বোনেদের নিয়ে খুবই ব্যস্ত থাকতে, তবে একান্নবর্ত্তী পরিবারে থাকার জন্য সকলে তাঁর দুঃখ কষ্ট ভাগ করে নিয়ে ছিলেন। এছাড়া তাঁর একমাত্র দাদা মামাবাবু এসে প্রায় প্রতিদিন তাঁর খবরাখবর নিতেন। আমাদের মেজ জ্যোঠিমা খুব সুন্দর গল্প বলতেন। জ্যেঠিমা ও মাকে দেখেছি ঠাকুমার নির্দেশ মত রান্নাঘরের বৃহৎ কর্ম্মকাণ্ডের সবকিছু নিপুণ হাতে সামলাতে।

আমাদের বাড়ীতে ছিলো বারোমাসে তের পার্বন। দোল, দুর্গোৎসব এমনকি ঘেটু পুজো পর্য্যন্ত। এছাড়া দিদিদের বিয়ে ছাড়াও আত্মীয় স্বজনের বিয়েও আমাদের বাড়ী থেকে হতো। এই সব কর্মকাণ্ডের মূলে ছিলেন ঠাকুমা। তাঁর অর্ডারে একটা ফুলটিম কাজ করতো তাদের মধ্যে ছিলেন আমাদের জ্ঞাতি গোত্রীয় কাকারা এবং তাঁদের বাড়ীর মহিলারা। এছাড়া রাখাল ছিলো তার Chief Secretary এবং সারদা ছিলো তাঁর বডি গার্ড। আমি ছিলাম তাঁর ছায়াসঙ্গী। রাতে ঠাকুমার কাছে শুয়ে তার ছোটবেলার গল্প শুনতাম। রাতে ঘরে কারুর প্রবেশাধিকার ছিলো না। ঠাকুমা অমরনাথ থেকে কন্যাকুমারীকা, কামরুপ কামাক্ষা নেপাল গঙ্গাসাগর সব তীর্থে গিয়েছিলেন। আমাদের বাড়ীতে দুর্গা পুজোয় খুব উৎসব হত। আমার ভাই ও ভাইপোদের কল্যাণে এখনো সেই সমারোহ বজায় রয়েছে।

আমাদের ছোটবেলা কেটেছে হেসে, খেলে মহা আনন্দে। ভাইবোনেরা সবাই মিলে মস্ত ছাতে লুকোচুরি, কিৎ কিৎ, বুড়ি বাসন্তি আরো নানা রকম খেলা করতাম। বুদ্ধুদার সঙ্গে বাজি তৈরী করতাম। ঘুড়ির জন্য সুতোয় মাঞ্জা দিতাম ম্যাজিক লণ্ঠনে সিনেমা দেখতাম। মাঝে মাঝে সন্ধ্যেবেলা সন্ধ্যাদি, রেখাদি, ফজলুর সঙ্গে গান শিখতে বসতাম। আমাদের পড়ানোর জন্য রোজ বিকেলে বীণা দিদিমণি আসতেন। ছেলেদের পড়ানোর জন্য একজন মাষ্টারমশাই বাড়ীতে থাকতেন।

ছোটবেলায় আমরা শুধুই খেলে বেড়াতাম না। আমাদের কিছু বিধিনিষেধ মানতে হতো পালা করে বড় মাকে খাওয়াতাম। ঠাকুমার রান্না করতাম। ঠাকুর ঘরে নিত্যপূজার জন্য প্রতিষ্ঠিত বানেশ্বর শিবের পুষ্পপাত্র ও প্রসাদ সাজাতাম। বৈশাখ মাসে নানা রকম ব্রত পালন করতাম। আমাদের বাড়ীর বাগানে অনেক গরু ছিলো। তাদের পূজা করতাম। এই পূজার নাম ছিলো গোকাল। এছাড়া পূণ্যি পুকুর, হরির চরণ আরো কত কিছু।

এবার একটা ছোট ঘটনা বলি। আমাদের বাড়ীতে দুর্গাপূজোয় ঠাকুমা অষ্টমীর দিন খুব সাড়ম্বরে সধবা ও কুমারী পূজা করতেন। একবার আমাদেরই পরিচিত খুব সুন্দরী একটি ছোট্ট মেয়েকে কুমারী রূপে পূজা করেন, বলেন এই মেয়েকে আমি নাতির বৌ করে আনবো। অনেক দিন পরে আমার বাবা এই মেয়েটিকেই তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বধূ করে নিয়ে আসেন। তখনো আমার জ্যেঠতুতো দাদারা কেউ বিয়ে করে নি। তাই বয়সে ছোট হলেও Seniority দিক দিয়ে বৌদি একটু এগিয়ে। এর পরে যারা বউ হয়ে এসেছে তারাও ব্যানার্জী বাড়ীকে একান্ত আপন করে নিয়ে ব্যানার্জী পরিবারকে গৌরবান্বিত করেছে।

এবার আসি আমাদের কথায়। সব থেকে বড় দিদি প্রতিমা (কুতু) ও মেজদি ঊষার (গাপী) বিয়ে হয়েছে যখন তখন আমরা খুবই ছোট। তাই তাদের কথা ভালো করে মনে নেই। কিন্তু যখন একটু বড় হলাম আরো দিদির বিয়ে হলো। আমরা সবাই মিলে কখনো সিনেমা, থিয়েটার ক্রিকেট খেলা দেখতে যেতাম।

সব থেকে মজা হতো যখন আমরা ভাইবোনেরা মিলে শীতের দুপুরে ছাদে গিয়ে পিকনিক করতাম। ঠাকুমার কাজের লোক সারদা ছাদে ছোট তোলা উনুন ধরিয়ে দিতো রাখাল সবকিছু জোগাড় করে দিতো। ছোটদাদু টাকা পয়সার দিকটা সামলাতেন। আমরা কখনো খিচুড়ি বেগুন ভাজা কখনো লুচি আলু ভাজা করে খেতাম। আমাদের সকলেরই প্রায় একটা করে ডাকনাম ছিলো। সন্ধ্যাদি (ফুলবালিকা), রেখাদি (খেকরু), ফজলু (ফজলেমিয়া) আমার নাম (পিনী) ইত্যাদি। রুবিদিকে বলা হতো রুবি গুণ্ডা। যাই হোক এরপর আসি লালিদি, অনিমাদির কথায়। দাদা, সেজদা, ছোটদা, লালিদিও অনিমাদি ছত্র ছায়ায় আমরা বড় হয়েছি। ভোরবেলা সবাই মিলে হেয়ার গ্রাউন্ডে যেতাম। প্রত্যেক শীতে জ্যেঠুর দমদমের বাগানে পিকনিক করতে যেতাম। এছাড়া সবাই মিলে রবীন্দ্র জয়ন্তী, স্বাধীনতা উৎসব পালন করতাম।

এরপর আমরাও বড় হয়ে গেলাম স্কুলে যেতে আরম্ভ করলাম দিদিদের বিয়ে হয়ে গেল। জামাই বাবুরাও আমাদের সব আনন্দের ভাগীদার ছিলেন।

ছোট বেলা হেসে, খেলে আনন্দে কেটে গেলেও দুঃখ যে একেবারে পাইনি তা নয়। ঠাকুমা জ্যেঠুরা, বাবা ও অন্যান্যরা যথা সময় মারা গেছেন। কিন্তু বাড়ীর সব থেকে ছোট মেয়ে খুকু ও সবার ছোট বউ ফাল্গুনীর মৃত্যু খুব দুঃখজনক।

আমার মা ছিলো খুব শান্ত। নাম ছিলো শান্তিলতা সবার প্রিয় ভালোবাসা দিয়ে আমাদের আগলে রাখতো। বাড়ীর ছোট ছেলের বউ বলে ঠাকুমাও মাকে সব কাজ শিখিয়ে জমিদার বাড়ীর বউ হিসাবে যোগ্য করে তুলেছিলেন। বড় জ্যেঠিমা ছিলেন না। কিন্তু দাদা দিদিরা আমাদের একান্ত আপন ছিলো। মা সারাদিন সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকতো তাই আমাদের খুব সময় দিতে পারতো না তাই আমাদের দেখাশোনা করতো ননী। সে ছিলো আমাদের পরম আপনজন। রাখাল ছিলো অনেক দিনের পুরোনো লোক, তাই সে বাড়ীর সব কাজ দেখাশোনা করতো। বারো মাসের পালা পার্বণ অনেকটা সে সামলাতো। এছাড়া দাদারা তো ছিলো সব কিছু দেখাশোনা করার জন্য।

ব্যানার্জী বাড়ীর অন্দর মহলে মাঝে মাঝেই বিচিত্র সব কাণ্ড ঘটতো। কখনো দেখতাম ঠাকুর দালানে কীর্ত্তনের আসর বসেছে। প্রচুর লোক জন গান শুনতে এসেছে, কিন্তু তাদের কাউকে আমরা চিনতাম না। কখনো দেখতাম মেজ জ্যেঠিমার ঘরে গানের আসর বসেছে, প্রধান গায়ক বুদ্ধু দা, তবলায় থাকতো খোকা দা। পাড়ার ক্লাব থেকেও ঠাকুর দালানে জলসা হতো। অনেক বড় বড় গাইয়েরা অংশগ্রহণ করতেন। প্রচুর লোক গান শুনতে আসতো রাতভোর গান বাজনা চলতো। কখনো দেখতাম মস্ত ছাতে ত্রিপল টাঙানো হচ্ছে। নীচে বরের সিংহাসন সাজানো হচ্ছে। হয়তো পাড়ায় কারুর বিয়ে হবে তারই ব্যবস্থা হচ্ছে তখন খুব মজা লাগতো। অনেক সময়ে পীসির মেয়েদের বিয়েও আমাদের বাড়ী থেকেই হতো। তাই সব সময় বাড়ীতে উৎসবের পরিবেশ থাকতো।

এছাড়া ছিলো শীতকালের দুপুরে দলবেধে বেড়াতে যাওয়া। এছাড়া বাড়ীতে বসেই দেখতাম সাপ খেলা, বাঁদর খেলা, ভালুক নাচ, টিনের বাক্সের মধ্যে বিচিত্র সিনেমা দেখা আরো কত কিছু। কোনো আনন্দ আনুষ্ঠানের ত্রুটি থাকতো না। তাও আমাদের খুব বিধি নিষেদের মধ্যে থাকতাম। সুখ, দুঃখ হাসি খেলায় অনেকটা পথ পেরিয়ে, পড়াশোনা শেষ করে শ্বশুর বাড়ী চলে এলাম কিন্তু আমার ৮ নম্বর পটুয়াটোলার প্রতি টান একটুও কমল না। সকলের বিপদে ছুটে গেছি। আবার সব আনন্দের মাঝেও সকলে আমায় ডেকে নিয়েছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো আমি স্নান যাত্রার একটি অনুষ্ঠান চালু করে ছিলাম। পুজোর আগে গাড়ী করে বাড়ীর সব বউ বাচ্চাদের নিয়ে মহালয়ার দিনে গঙ্গাস্নানে যেতাম। আমাদের প্রজন্মের সকলেই বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত। অনেকেই অন্যত্র চলে গেছে। নতুন প্রজন্মের অনেকেই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে রয়েছে কিন্তু এখনো ৮ নং পটুয়াটোলা লেনের আকর্ষণে সবাই ফিরে ফিরে আসে। সবাই ভালো থাকুক। আরো অনেক অনেক দিন সুন্দর উৎসবের আয়োজন করে সবাইকে আনন্দ দিক।

আমাদের বাড়ীর দুর্গাপূজো

সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশে শরতের মেঘ মাঝে মাঝে বৃষ্টি —পুজো এসে গেলো। চতুর্দিকে জামাকাপড়ের বিজ্ঞাপন। দোকানে দোকানে পুজোর শাড়ী, জামা কাপড় কেনার ভিড়। পাড়ায়, পার্কে প্যাণ্ডেল তৈরী হচ্ছে। জন্মাষ্টমীর দিন কাঠামো পুজোর মধ্যে দিয়ে আমাদের বাড়ীর পুজো শুরু হল। এরপরে শুরু হবে বোধন, ষষ্ঠী থেকে শুরু হবে দেবীপূজা।

মনে পড়ে ছোটবেলায় পুজোর অনেকদিন আগেই কুমোরটুলি থেকে আমাদের বাড়ীর কুমোরেরা ঠাকুর দালানে ঠাকুর গড়ার কাজ শুরু করত। আমরা দলবেধে নাওয়া খাওয়া ভুলে ঠাকুর দালানে ঠাকুর গড়ার কাজ দেখতুম। পড়াশোনার তত চাপ থাকত না।

পটুয়াটোলা লেনের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে দুর্গাপুজোর ইতিহাস অনেক পুরনো। অনেক কাল আগে আমাদের কোন পূর্ব পুরুষ ঢাকা বিক্রমপুর থেকে জয়নগর মজিলপুরে নবগ্রাম বসবাস শুরু করেন। পাস দিয়ে ঠাকরান খাল বয়ে যেত। উর্দ্ধোতন দশম পুরুষ দুর্গাদাস স্বপ্নাদেশ পেয়ে ঠাকরান খালে ভেসে আসা নিম কাঠ দিয়ে কালীমূর্তি গড়ে মন্দিরে নিত্য পূজার ব্যবস্থা করেন। সেই মূর্তি নঁগার কালী নামে পরিচিত। তখন বাংলাদেশে মুসলমান রাজত্ব। পটুয়াটোলা লেনে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার কবে এসেছিল জানা যায় না সেই সময় উত্তর কলকাতার এই অংশ ছিল খাল, বিল ডোবা আর ঘন জঙ্গলে হিংস্র জন্তুরা ঘুরে বেড়াতে তখন জায়গাটা ছিল গ্রাম চারিদিকে কাঁচা বাড়ী। বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন বাসস্থান গড়ে উঠতে থাকে রাস্তার দুপাশে। কালক্রমে সেগুলো পাকা বাড়ীতে পরিণত হয়। এখনও সেইসব বাড়ীতে আমাদের অংশীদার বসবাস করেন। এখানে এক অংশীদারের বাড়ীতে নঁগারকালির ঘট নিত্যপূজা হয়।

প্রায় ৩০০ বছর আগে এক অংশীদারের বাড়ীতে পটুয়াটোলা লেনে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের দুর্গাপুজোর শুরু সেই খান থেকে

প্রায় ২৫০ বছর আগে ৯/২ নং পটুয়াটোলা লেনে অন্য এক অংশীদারের বাড়ীতে পূজো স্থানান্তরিত হয়। সেই পুজো এখনও চলছে।

আমাদের পরিবারের পূর্বপুরুষ ৯/৪ পটুয়াটোলা লেনে বসবাস শুরু করেন। আমাদের উর্দ্ধোতন ষষ্ঠ পুরুষ ছিলেন তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সেই সময় অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত আর প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। ধীরে ধীরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলাদেশে রাজ্য বিস্তার শুরু করে। সুতানটি, গোবিন্দপুর, কলিকাতা সম্প্রসারিত হতে থাকে পরে নাম হয় কলকাতা। কলকাতা হয়ে ওঠে বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরী লণ্ডনের পরেই। ভারতের বড় বড় রাজা, মহারাজা, জমিদার, ব্যবসায়ীরা কলকাতায় বড় বড় প্রাসাদ তৈরী করে বসবাস শুরু করেন।

তারাচাঁদ বাবুর স্ত্রী ছিলেন দীনময়ী দেবী। তাঁদের ১১ জন পুত্র কন্যার মধ্যে বেনীমাধব ছিলেন দ্বিতীয়, জন্মগ্রহণ করেন ১৮২৭ সালে। তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান। কৃতিত্বের সঙ্গে হিন্দু কলেজে পড়াশোনা শেষ করে ১৮৪২ সালে রেমফ্রিতে চাকরি গ্রহণ করেন পরে চাকরি ছেড়ে বিখ্যাত এ্যাটর্নী ফার্ম হেনরি ওয়েনে শিক্ষানবিশী শুরু করেন। সেই সময় সুপ্রীম কোর্ট ছিল কলকাতায় ১৮৫২ সালের ২২ শে জানুয়ারী প্রধান বিচারপতি লরেন্স শিলের কাছে এ্যাটর্নী হিসেবে নাম নথিভুক্ত করেন। তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় এ্যাটর্নী। তিনি Henry Owen এর Attorney firm- এ Partner হিসেবে Join করেন। Firm এর নাম হল Owen and Bonnerjee.

অসাধারণ আইনজ্ঞ হিসেবে তিনি সুনাম অর্জন করেন। তিনি রানী রাসমনি, রানী বিন্দুবাসিনী, রাম দুলাল সরকার প্রমুখ সম্ভ্রান্ত পরিবারের আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে স্বল্প রোগ ভোগের পর ৫ই জুলাই ১৮৫৯ সালে মাত্র ৩২ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

তাঁর দুই স্ত্রী শ্যামাকালী দেবী আর হেমীঙ্গিনী দেবী। হেমাঙ্গিনী দেবী ছিলেন নিঃসন্তান। শ্যামাকালী দেবীর এক পুত্র বিনোদবিহারী আর এক কন্যা মীরা রাণী। সেই সময় বিনোদবিহারী বয়স ছিল ৮ বছর আর মীরা রানীর বয়স ছিল মাত্র ২ বছর। মৃত্যুকালে বেনীমাধব অগাধ সম্পত্তি রেখে গেছিলেন। মৃত্যুর ২ বছর আগে ৯ মে ১৮৫৭ সালে তিনি দীননাথ কর্মকারের কাছ থেকে পটুয়াটোলা লেনে মোট ২৬ কাঠা ৮ ছটাক জমি টাকা ৪৪৮-৪-৬ পাই দিয়ে ক্রয় করেন। এর মধ্যে ১০ কাঠা জমিতে ৮ নম্বর পটুয়াটোলা লেনে বিশাল বসতবাড়ী আর বাকি ১৬ কাঠা ৮ ছটাক জমিতে ফুলের বাগান, গোয়াল, আস্তাবোল তৈরী হয়। বাড়ী তৈরী শেষ হয় ১৮৯০ সালে।

ঠাকুমার নাম ছিল মৃণালিনী আর ছোট ঠাকুমা নন্দরানী। ঠাকুমা বিয়ের পর ৯/৪ নম্বর বাড়ীতে থাকতেন। তার বেশ কিছুদিন পরে ৮ নম্বরে বাড়ী তৈরীর কাজ শেষ হয়। ঠাকুমার কাছে শোনা সেই সময় রাত্তিরে নানা রকম হিংস্র জন্তুর ডাক শোনা যেত। বিশাল ঠাকুর দালানে ১৮৯০ সালে দুর্গাপুজো শুরু হয়। এখনও পর্যন্ত এ পাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের এটাই শেষ

বাড়ী। বিনোদ বিহারী আর বিশ্বরঞ্জন দীর্ঘজীবি ছিলেন না।

সেই সময় সারা বছরই এ বাড়ীতে নানা রকম অনুষ্ঠান পুজো পার্বন লেগেই থাকত। দুর্গাপুজোতে সপ্তমি, অষ্টমী, সন্ধিপুজো আর নবমীর দিন মিলিয়ে ৪টে পাঠা কাটা হোত এ ছাড়াও নবমীর দিন আখ, চালকুমড়ো বলি হত। তারপর শুরু হোত কাদামাটি খেলা। বোধন থেকে বিসর্জন পর্যন্ত আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবে বাড়ী ভরে থাকত। সম্ববত ১৯৫০ সালে অষ্টমীর দিন বলিতে বাধা পড়ে বলিদান আটকে যায়। বাড়ীতে অমঙ্গলের আশঙ্কায় স্তব্ধতা নেমে আসে কান্নাকাটি শুরু হয়ে যায়। সম্ভবত ১৯৫১ সালে ঠাকুমা মারা যান। পুজোর দায়িত্ব এসে পড়ে মেজ জ্যাঠাইমা, মা আর বাড়ীর মেয়েদের ওপর। প্রত্যেকেই অবশ্য বহুদিন ঠাকমার কাছে সব কিছু নিখুত ভাবে শিখে নিয়েছে। তারপর থেকে পাঁঠাবলি বন্ধ হয়ে যায়।

অল্প বয়সে বিধবা হবার পর ঠাকুমা দলবল নিয়ে তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তেন। অতদিন আগে ভারতের দুগর্ম-তীর্থে ঘুরতে যাওয়া খুবই সাহসের পরিচয়। ঠাকুমা আমাদের ছোটবেলায় কেদার বদরী পশুপতিনাথ, কন্যাকুমারী আরও অনেক জায়গায় বেড়াবার গল্প করতেন। ঠাকুমার মা আর দুইভাই এ বাড়িতেই থাকতেন পরে মারা যান।

বিশাল ভূসম্পত্তি দেখাশোনরা দায়িত্ব ছিল ছোট ঠাকুরদার সতীরঞ্জনের ওপর।

আমার ঠাকুদ্দা ছিলেন বিশ্বরঞ্জন। বড় ছেলে সৌরিন্দ্রমোহন, মেজো হীরেন্দ্রমোহন আমার বাবা ছোট মানিকলাল। দুই মেয়ে নলিনী আর রানী। জ্যাঠামশায় আর বড় পিসিমার শ্বশুরবাড়ী ছিল বড় বাজারের গাঙ্গুলী বাড়ী মেজো জ্যাঠামশায়ের শ্বশুর বাড়ী টালা। ভবানীপুরের হাইকোর্টের বিচারপতি বিখ্যাত দ্বারিকানাথ চক্রবর্তী ছিলেন মার ঠাকুদ্দা।

ছোট ঠাকুদ্দা সতীরঞ্জনের ছিল তিন ছেলে দাশরথি, মনীন্দ্র মোহন, যতীন্দ্র মোহন আর এক মেয়ে বিজলী। সারা বছরই বাড়ীতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা চলত। মেজো জ্যাঠামশায়ের ছেলে বুদ্ধদেব অসাধারণ প্রতিভাবান সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। সারা ভারতের সঙ্গীত সমাজ মন্টু কাকাকে চিনতেন। তিনি প্রথমে তবলা শেখেন আবিদ হোসেন, আনখিলাল মিশ্র পরে মজিদ খানের কাছে। পরে হারমোনিয়াম শেখেন মুনেশ্বর দয়ালের কাছে। সঙ্গীতের আসরে যারা নিয়তি আসতেন অনেকেই ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ যেমন বাদল খাঁ (বুদ্ধদেবের গুরু) গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্তী, রাইচাঁদ বড়াল ভীষ্মদবে চট্টোপাধ্যায়, শচীন দাস মতিলাল, জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ, মাঝে মাঝে নজরুল ইসলামও আসতেন।

বাবার সখ ছিল বেড়ানো আর মাছ ধরা। ইতিমধ্যে ছোট ঠাকুদ্দা সতীরঞ্জন মারা যান। দুই তরফের মধ্যে Partition মামলা শুরু হয় ১৯৩১ সালে। ২৯ শে জুন ১৯৩৪ সালে সেই মামলার আপোষ মিমাংসা হয়। বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের কুলদেবতা বানেশ্বরের পুজো, দুর্গাপুজোর দায়িত্ব ঠাকুমার কথা মত আমাদের বংশের হাতে

থাকে। বিশাল সম্পত্তি দুভাগ হয়। দাশুকাকারা হরিশ মুখার্জী রোড, ভবানীপুরে ১৬ কাঠা জমির ওপর বাড়ী তৈরী করে চাল যান।

দু তরফের যোগাযোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়। আমার যতদূর মনে পড়ে ১৯৭০ সালে জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর মন্টুকাকা প্রথম বাড়ীতে আসেন।

১৯৭০ সালের পর পুজোর দায়িত্ব আমাদের ওপর এসে পড়ে। ১৯৮৯ সালে খুবই জাঁক জমকের সঙ্গে পুজোর শতবার্ষিকী তারপর ১২৫ বছরের পুজোর পুর্তি উদ্‌যাপিত হয়। ধীরে ধীরে পরিবারের অনেকের মৃত্যু হয়। অনেকে ফ্লাট বা বাড়ী করে অন্য জায়গায় চলে যায় পরবর্তী প্রজন্মের অনেকেই এখন বিদেশবাসি। নতুন নতুন বৌরা এসে পুজোর দায়িত্ব নিয়েছে। বিনোদ বিহারীর পর এখন চতুর্থ প্রজন্ম সব দেখাশোনা করে পঞ্চম প্রজন্মেরও অংশ গ্রহণ শুরু হয়। সকলে একসঙ্গে পুজোর দিনগুলোয় মিলে মিশে আনন্দ করে কাটানো হয়, মনে আশা নিয়ে আসছে বছর আবার হবে।

দুর্গাপুজোর স্মৃতি এখনও খুব মনে পড়ে

আভা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজেদের বাড়ীতে পুজোয় থাকা একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা। বিয়ের আগে পাড়ার পুজো দেখতাম—ছোট ছোট ভাই বোনেদের হাত ধরে ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যেতাম।

বিয়ের আগে যখন শুনলাম শ্বশুর বাড়ীতে পুজো হয় শুনে মনটা আনন্দে নেচে উঠেছিল। মহালয়ার দিন থেকে পুজোর জন্য বোধন ঘর নৈবেদ্যের ঘর ঠাকুর দালান পরিষ্কার করা হত। পুজোর সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করার দায়িত্ব ছোড়দার ওপর ছিল। তাঁকে সাহায্য করত শ্যামাপদ নামের ছেলেটি—সে তার আগেই দেশ থেকে এসে যেত। অবাক হয়ে দেখতাম কত যে জিনিস লাগে। তাঁর সঙ্গে ঘড়া ঘড়া গঙ্গাজল। সমস্ত বোধন ঘরে জমা হত। যেহেতু বাড়ীর পুজো তাই প্রতিপদে ঘট বসানো হত মাটির বেদির নীচে। বেদির ওপরে বেলগাছের ডাল পুঁতে মা তখন বিশ্ববাসিনী মা দুর্গা রূপে পূজিত হন। প্রতিপদের সকালে জ্যাঠামশাই এর বড় ছেলের নামে সংকল্প হত।

সেদিন থেকেই মায়ের উদ্দেশ্যে তিন রকম অন্নভোগ হত সাদা ভাত, খিচুড়ি ও পরমান্ন এবং তার সঙ্গে কলার বড়া সহ পাঁচরকম ভাজা, দু'রকম তরকারী এবং চাটনী ভোগে সাজিয়ে দেওয়া হত। আমাদের শাশুড়ীমা ও এক জ্ঞাতি ঠাকুমা মিলে ভোগ রান্না করতেন। প্রথমদিন থেকে সন্ধ্যাদি সমস্ত কাজ মা ও মেজ জ্যাঠাইমাকে সাহায্য করতেন। তারপর এসে যেতেন লালিদি, অনিমাদি—এঁরা পুজোর কাজে খুবই দক্ষ ছিলেন। আমরা তখন পাঁচবৌ ছিলাম—সবাই মিলে নৈবেদ্য সাজানো ফল কাটা, পান সাজা, নাড়ু তৈরীতে হাত লাগাতাম। আমি তখন নতুন বৌ তাই সবার ফরমাশ মত কাজ করতাম।

পঞ্চমীর সন্ধ্যে পর্যন্ত বোধন ঘরেই ভোগ, আরতি, অঞ্জলী এবং সন্ধ্যোবেলায় লুচি, মিষ্টি ও তরকারী দিয়ে মাকে শেতল দেওয়া হত। আমরা বৌয়েরা ভাগাভাগি করে এই কাজগুলো করতাম। মহাষষ্ঠীর দিনে মা দুর্গার বরণ ও অধিবাস হত, তারপর আবার আরতি হত। পরদিন থেকে বড় পূজো শুরু হয়ে যেত। আমরা বোধনঘরে বসে পরের দিনের ভোগের উপকরণ গুছিয়ে রাখতাম এবং সব্জীও কেটে রাখতাম। মা ভোর চারটের সময় ভোগের ঘরে চলে যেতেন, সঙ্গে থাকত সন্ধ্যাদি ও ছোড়দি। নতুনদি, আমি বেনুদি, সুমিতা বোধন কাজ করতাম। মহাসপ্তমীর দিন বৌদের বাপের বাড়ীর সকলে ও ননদেরা এসে যেতেন। সেবার যখন সপ্তমীর দিন ঠাকুরের সামনে বসে আমি ও খুকু বেলপাতার মালা গাঁথছিলাম তখন আমার

বাবা আমার মা, দিদা ও ভাই বোনেদের নিয়ে এলেন এবং ঠাকুর দালানে আমাকে কাজ করতে দেখে খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। আমার তিন ভাই তিন দেওরের সমবয়েসী ছিল তাই তারা সবাই মিলে খুব মজা ও আনন্দে মেতে থাকত। আর ছিলো খোকা বড় জা এর ভাই—সবাইকে নানা ভাবে মাতিয়ে রাখত। রোজই আসত তখন। তারপরের বছর আমি মা হলাম। টুম্পা ভাদ্রমাসে হয়েছিল, আশ্বিন মাসে পুজো, শিশু কন্যাটিকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য ঠাকুর দালানে নামতে পারিনি—সেবার ছোড়দিরও দ্বিতীয় সন্তান বুড়োর আষাঢ় সংক্রান্তিতে জন্ম হয়—তাই ছোড়দিও পূজোর কাজ করতে পারেনি। বড় পূজোয় অর্থাৎ ষষ্ঠী থেকে লালিদি, অনিমাদি এসে যেতে অনেক সুবিধা হয়েছিল। আর সন্ধ্যাদি তো সবসময় সবকাজে এগিয়ে যেতেন। নতুনদির মুনমুন তখন ৫/৬ বছরের তাই নতুনদি বোধন ঘরে অনেক কাজ করতেন, সুমিতার ছেলেও তখন ছোট। বোধনের সময় কাজের সমস্যার জন্য মা ও মেজ জ্যাঠাইমার পরামর্শ মত আমার নিজের বোন রতন এবং দুই মাসতুতো বোন বাপি ও পিতু এই তিনজনকে আনিয়ে ছিলাম। তারাও মহা উৎসাহ নিয়ে আগ্রহ সহকারে সকলের কথামত সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন করেছিল। পরে মা, মেজ জ্যাঠাইমা, সন্ধ্যাদি, নতুনদি ওদের নিষ্ঠা সহকারে এবং সুষ্ঠভাবে কাজের খুব প্রশংসা করেছিলেন। ওরা এখনও দিদির বাড়ীর পুজোর গল্প করে। সে বছর কচি মেয়ে কোলে নিয়ে নতুন শাড়ী পড়ে ঠাকুর দালানে আরতির সময় গিয়েছিলাম। ছোড়দিও বুড়োকে নিয়ে যেত। সেই কচি মেয়ে আমার এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরতা মেয়ের মা।

আমাদের সেই বুড়ো এখন পুজোর অন্যতম মূলহোতা। ওর নামেই সংকল্প হয়। মা দুর্গার প্রতি তার ভক্তি অবিচলিত আমাদের বৌমাটিও (ঝুম্পা) খুব ভক্তিমতি। ওদের ছেলের কথা বলতেই হয়। অর্জুন, ভালো নাম আরণ্যক খুবই সুন্দর হয়েছে দেখতে। আগামী বছর আমাদের পূজোর ১৩০ বছর পূর্ণ হবে। আশা রাখছি বিদেশে যারা থাকে তারা নিশ্চই পূজোয় অংশগ্রহণ করবে। এই প্রজন্মের সকল ছেলেই পূজো নিয়ে খুব উৎসাহী এবং সাধ্যমত পূজো ভালোভাবে ও জাঁকজকম সহকারে যাতে হয়, সে ব্যাপারে খুব সচেষ্ট থাকে। টুটুন বাবু এখন মাকে বেনারসী শাড়ীতে সজ্জিত করে নিজেকে ধন্য করছে আমাদের পুজোর প্রাক শতবর্ষ, শতবর্ষ, এবং একশো পঁচিশ বছর — খুবই জাঁকজঁকম সহকারে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়েছে। শতবর্ষের ভি.ডিও তোলা হয়েছিল। এবং একশো পাঁচিশ বছরে আমাদের স্নেহের টুপুর মহালয়া থেকে সকলের সাক্ষাৎকার সহ পূজোর আরতি এবং আরও অনেক খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে খুব সুন্দর ডকুমেন্টারী তুলেছে। আমাদের সকলেরই সেটা খুব ভালো লেগেছে।

মহাসপ্তমীর থেকে সন্ধ্যের সময় ঠাকুর দালানে সান্ধ্যআরতির পর মুনমুন গান বাজনার আসর বসায়। নিজেরা ভাইবোনেরা মিলে গান করে। বৌমাদের মধ্যে ঝুম্পা, বাণী নৃত্য পরিবেশন করেছিল। আর নাতনীরা ও নাচে অংশ গ্রহণ করেছিল; বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে

বুড়ি, বিয়াংকা, তুলতুলি গানে অংশ গ্রহণ করে থাকে। একবছর আমার ছোট বোন মিঠুও গান করেছিল। তবে শতবর্ষের পূজোয় মহাষ্টমীর সকালে স্বর্গীয় শ্রী রামকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রী বীরেন ভদ্র মহাশয় এসেছিলেন এবং রামকুমারের আগমনী ও পুরাতনী গানে আসর জমিয়ে ছিলেন, আর বীরেন ভদ্র মহাশয় অপূর্ব চণ্ডীপাঠ করেছিলেন।

সে সমস্ত শতবর্ষের ভি.ডিওতে মূর্ত হয়ে আছে। আর বিয়ের পর থেকে প্রায় প্রতিবছরই নতুন দির বোন ইরা মুখার্জী যে আমাদের অকালে ছেড়ে চলে গেছে, তার গানে বাড়ী মুখর হয়ে থাকত। সে খুব গুনি ছিল। সঙ্গীতের জন্য অনেক পুরষ্কারে পেয়েছিল—দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে প্রিয়দর্শিণী পুরষ্কারও পেয়েছিল। তার মেয়ে এষা আমাদের সকলেরই খুব প্রিয়। আরও কত কথা যে লিখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু হাত টানতেই হবে শেষ করার আগে ন'দেওর সুমিত ও তাঁর স্ত্রী সর্ব্বাণীর কথা না বললেই নয়। ওরা দুজনে পূজোর দিকটা অনেক সামলায়। আমরা এখন বয়স্কদের দলে-উদ্যোগ ও সামর্থ খুবই কমে গেছে। মহাচতুর্থীর দিন থেকে বাড়ীতে যাই। আশা রাখি ঠাকুরের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারব। তবে ঝন্টু আমাদের পরিশ্রম অনেক কমিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া ভোগ রান্না এখন গ্যাসের উনুন হয়। বিকেলের শেতলের ব্যবস্থাপনার জন্য সর্ব্বানীর উদ্যোগে দু'জন মহিলাকে নিয়োগ করা হয়েছে।

এখনমা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করি সকলে যেন সুস্থ থাকে এবং পূজোর কটা দিন স্বপরিবারে আনন্দ করতে পারি। এই প্রজন্মের সুন্দরী বৌমারা — রিঙ্কু, পিয়ালী, মুন্নি বানী ঝুম্পা — এরা অপূর্ব্ব

সাজগোজ করে ঠাকুর দালান আলো করে রাখে এবং পূজোর কাজেও অংশগ্রহণ করে।

বিজয়া দশমির দিন সকালে বেড়া অঞ্জলী হয়। তারপর মাকে কচুশাক ও পান্তা ভাত, দই মিষ্টি ভোগ দেওয়া হয়। তারপর অঞ্জলী এরপর সত্যনারায়ণ ও সুবচুনির পূজো হয়। সেদিন সিন্নী মাখা হয়। তার আগে দধিকর্ম্মা মাখা হয়। তারপর সময়ানুসারে মাকে বৌদের মধ্যে একজন বরণ করে। আমরা সকলেই মাকে সিঁদুর পরিয়ে পান-মিষ্টি খাওয়াই। এরপর শুরু হয় সিঁদুর খেলা। ভাসানে ছোটরা যায় তাদের সঙ্গে বড়রাও। আমার জামাই বিশ্বজিৎ, বুড়ির বর যিশু, দিদিভাই এর ভাই খোকা লরিতে উঠে দুর্গা মাই কি জয় বলতে বলতে ঢাকিদের ঢাক কাঁসর বাদ্যির সঙ্গে সবাই বাবুঘাটে মাকে বিসর্জ্জন দিয়ে ফিরে আসে। এরপর সন্ধ্যের সময় ঠাকুর দালানে আরতি ও শান্তি জলের অনুষ্ঠান শেষে শুরু হয় শুভ বিজয়া। গুরুজনদের প্রণাম ও ছোটদের আশীর্বাদ করার পালা। উঠোনে খুব হৈ চৈ হয়।

বাড়ির পূজা ও আমি

সুবীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ ১৬ই আগষ্ট ২০১৯। একটু আগে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব এবছরের কলকাতা ফুটবল লীগ জিতল। মোহবাগানের অনেক আশা নিয়ে ম্যাচটা দেখছিলাম কিন্তু যখন ব্যাপারটা উল্টে গেল তখন মনটা খারাপ হয়ে গেল। ব্যাপারটা ভোলার জন্যই লেখাটা শুরু করছি। অনেকদিন বাংলা লেখার অভ্যাসটা নেই। আগে চিঠি লেখার একটা প্রথা ছিল, বিশেষ করে শুভ বিজয়ার পর দূরবর্তী গুরুজনদের প্রণাম জানাবার জন্য চিঠি লিখতেই হত। আজকাল মোবাইলে সে ব্যাপারটা মিটে যায়। আর গুরুজনই বা কোথায়? মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া সকলেই পরপারে—আমরাই এখন বুড়ো হয়ে এপারে রয়ে গেছি। অজ্ঞাতটাই আমাদের বাঁচার রসদ। স্মৃতি নিয়েই বেঁচে আছি। লেখার ভুল ত্রুটি বা স্মৃতিচারণের পরম্পরা রক্ষায় ব্যর্থতা গুলো মার্জনা করার জন্য তাই পাঠকদের অনুরোধ করছি।

আমাদের বাড়ির দুর্গাপুজা এবছর ১৩২ বছরে পড়ছে। ১৮৮৯ সালে যখন পূজাটা শুরু হয় তখন আমি কোন লোকে কিভাবে ছিলাম জানিনা। আমাদের প্রপিতামহের পিতা ও বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম এ্যাটর্নি ছিলেন — সেই সূত্রে তাঁর উপার্জনও ছিল প্রচুর। তাঁর ও বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় নানা ব্যবসায় সেই উপার্জনের ধারা অব্যাহত রাখেন। আমাদের এই ৮ নং পটুয়াটোলা লেনের বাড়ি তিনিই তৈরী করেন আর এ বাড়ির দুর্গাপুজোর শুরুও হয় সেই সময় থেকেই। তাঁর আমলে আমাদের পারিবারিক চালচলন অত্যন্ত জাঁক জমকপূর্ণ ছিল। আর আশেপাশে আমাদের পরিচিতি ছিল 'জমিদার বলে আর পূজাও হত অত্যন্ত ধূমধাম করে। আশপাশের সব বাড়িকে ষষ্ঠী থেকে দশমী অবধি নিমন্ত্রণ করা হত। আর পূজায় ছিল তাঁদের সবার অবাধ প্রবেশাধিকার। বিশাল কর্মযজ্ঞের ভার তাঁরাই সামলাতেন। প্রপিতামহ অভিভাবক হিসাবে সব ব্যাপারটা তদারকী করতেন পুজার প্রত্যেকদিন বাড়িতে নানা অনুষ্ঠান হত। কলকাতার নামকরা সব গাইয়ে বাজিয়েরা আসতেন। তাঁদের উচ্চাঙ্গের অনুষ্ঠানের মধ্যে সমগ্রবাড়ির পরিবেশটাই আনন্দময় হয়ে উঠত। আমার পিতামহও সেই পরম্পরা বজায় রেখেছিলেন।

এ বাড়ির পূজা আমি দেখছি মোটে সাতষট্টি বছর ধরে। এর প্রথম ক'বছর কেটেছিল আমাদের বাড়ির কাজের লোকের কোলেতে ছেলেবেলা আমরা মায়েদের সান্নিধ্য খুব একটা পেতাম না—সেটা কেটে যেত দিদি বা কাজের লোকেদের কোলে কোলে। আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি কাজের লোকেদের দাপট বাড়ির লোকদের থেকেও বেশী থাকত। তাদের আমাদের বাড়ির প্রতিটান কতটা গভীর

ছিল সেটা লিখে বোঝানো যাবে না, সেটা উপলব্ধির ব্যাপার। যাই হোক্, কোলে কোলে বছর কয়েক কাটানোর পর যখন একটু হাঁটতে চলতে শিখলাম তখন থেকেই পূজার কয়েক মাস কাটত একতলাতেই। আমাদের বাড়িটাকে লোকে শুধু শুধু জমিদার বাড়ি বলত না। বাড়িটা সত্যিই দেখার মত। বাড়ির বিশাল সেগুন কাঠের সদরদরজা টেনে ভিতরে ঢুকেই একটা বিশাল বেলে পাথরের উঠোন, বাঁদিকে বিশাল মার্বেল পাথরের ঠাকুর দালান আর ডানদিকে মার্বেল পাথরের দালান। তার পাশেই বৈঠকখানা। উঠনেই দেখা যেত নানান জাতের পাখি পায়রা আর বিভিন্ন প্রজাতির ময়ূর। সুতরাং যারা বাড়িতে আসত তারা সবাই অবাক হয়ে যেত নানান বৈভবের সমারোহ দেখে। দোতলাতেও দামী মার্বল পাথরের দালান। আরেকটা মহলকে ঘিরে বিশাল রান্নাঘর, তার পাশে বিশাল খাওয়ার-দালান যাতে সকাল বিকাল মিলিয়ে প্রতিদিন ১০০ জনের বেশী লোকের পাত পড়ত। তখনকার আমাদের বাড়িতেই কিছু আশ্রিত থাকত কিন্তু তাদের সমাদরে আন্তরিকতার কোন ত্রুটি থাকত না।

আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি প্রতিমা গড়া হত তিন চার মাস ধরে। প্রথমে হত কাঠামো, তারপর খড়ের তৈরী মা দুর্গা ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের অবয়ব তারপর মাটির প্রলেপ, রঙ, চক্ষুদান এবং অবশেষে শাড়ি-পরানো ইত্যাদি। কুমোররা তিন চার মাস ধরে নিত্য আনাগোনা করত। আর আমরাও ঐ সময় একতলায় চুপচাপ কাজ গুলো দেখে যেতাম। আমরা বলতে আমাদের দলে থাকত খুকু দি, টুলু, পল্লব গোবলু আর অলক। খুকুদি ছাড়া অন্যরা আমাদের ভাগ্নে, ভাগ্নি হলেও বয়সে প্রায় সমান। ঐ সময় নিজেদের মধ্যে খেলাধূলা চললেও ঠাকুর গড়া দেখাটাই প্রধান ছিল। আমরা কুমোরদের কাছে বায়না করতাম এটা সেটা বানিয়ে দেবার জন্য আর ওরাও বানিয়ে দিত নানা রকমের পুতুল। সেগুলো যত্ন করে সংরক্ষণ করা থাকত আর নজরে থাকত কেউ যেন সেগুলো নিয়ে না পালায়। এখন ছেলে মেয়েরা কিছু চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে তা পেয়ে যায়। আমরা তা পেতাম না তাই যা পেতাম তাতেই আমাদের আনন্দের শেষ থাকত না।

যাই হোক, প্রতিপদ থেকেই বাড়ির পূজার বোধন বসে যেত আর তা চলত ষষ্ঠীর দিন সকাল পর্যন্ত। সেদিন রাত্রি থেকেই আসল পূজা শুরু হত আর ঠাকুর দালানে আমাদের অবাধ আনাগোনা বন্ধ হয়ে যেত। ঠাকুর পূজার নানান কাজ কর্মের প্রধান দায়িত্ব খাতায়-কলমে মার আর মেজ জ্যাঠাইমার হাতে থাকলেও আসলে পরিচালনা করত অনিমাদি আর লালিদি। ওরে বাব্বা, তাদের যেমন গলার জোর আর তেমনি দাপট। অন্যরা টাঁ ফু পর্যন্ত্য করতে পারত না। অন্য সব দিদিরা ছিল তাদের হুকুম বরদার। ওরা দুজন যা বলত অন্যরা নিঃশব্দে পালন করে যেত আর আমরা সেদিন থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে যেতাম—সকাল থেকে রাত্রি অবধি শুধু দৌড় ঝাঁপ আর হৈ চৈ। অবশ্য এর মধ্যে ছিল ভোরবেলা আমাদের বাড়ি সংলগ্ন বাগান থেকে ফুল তোলার একটা পর্ব। তুলতে যেতাম

আমি টুলু আর খুকুদি। বাড়ির বাগানে প্রচুর শিউলি ফুল ফুটত আর গাছটায় থাকত অসংখ্য শোঁয়পোকা। এর শোঁয়াগুলো হাতে লাগলেই বেশ জ্বালা করত। ফুল তুলে বাড়িতে এসে একটু চেঁচামিচি করলেই দিদিরা তার পরিচর্যা করে দিত। ব্যথা একটু কমলেই সবকিছু ভুলে হয়ে যেত খেলা শুরু। মাঝে কাজ ছিল অঞ্জলি দেওয়া আর খাওয়া দাওয়া। পুষ্পাঞ্জলির ফুলের বেশীর ভাগটাই আমাদের দমদমার বাগান থেকেই আসত আর কিছুটা কেনা হত। পল্লব, অলক ও গোবলু আমাদের দলের সদস্য হলেও ওরা কখনও ফুল তুলতে যেত বলে মনে পড়ে না। ষষ্ঠীর দিন থেকেই পিসীমারাও আসতেন তবে থাকতেন বলে মনে পড়ে না। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল ছোট পিসীমার ছেলে কানুদার কথা। অসম্ভব ভাল গল্প বলতে পারত। কানুদা বছরে কয়েকবার শিকার করতে যেত, কিন্তু জীবনে একটা ইঁদুর পর্যন্ত শিকার করতে পেরেছে বলে মনে পড়ে না। সুন্দর বনের বাঘেরা কানুদাকে চিনত আর খুব ভয় পেত তাই কানুদা শিকারে গেছে খবর পেলেই ওরা সব শহরে চলে আসত। তবে গল্প বলতে পারত বটে কানুদা বাড়িতে এলেই আমাদের সমস্ত দুষ্টুমি বন্ধ হয়ে যেত আর শুরু হত ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প শোনা। পরে হরিদা ঐ style টা রপ্ত করেছিল। দেখেছি মুনমুন, শোভন, রুপুন দারুণ আগ্রহ নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা হরিদার গল্প শুনে যেত। পূজার খাওয়া দাওয়ার এলাহি আয়োজনের প্রধান দায়িত্ব ছিল যতদূর মনে পড়ে মেজদার উপর। সাহায্যকারি হিসাবে থাকত ছোড়দা, সেজদা, কানুদা আর কোরবাবু বলে সেজ দার এক বন্ধু। বাড়িতে ভিয়েন বসত। নানা মিষ্টি তৈরী হত পূজার আগে থেকে আর তাতে থাকত আমাদের অবাধ অধিকার। এছাড়া পুজো বাড়িতে যারাই আসত তারাই নিয়ে আসত নানান ধরনের উৎকৃষ্ট মিষ্টি আর তা থেকে আমি কখনই বঞ্চিত হতাম না কারণ লালিদি আর অনিমাদি অর্থাৎ আসল মালকিনরা আমাকে একটু বেশী ভাল বাসত। আর তাছাড়া মিষ্টিগুলো কোথায় রাখা থাকত তাতেও আমার বিশেষ নজর থাকত। ধরা পড়লে একটু আধটু বকুনি বা কানমোলা—তার কোন গুরুত্ব আমার কাছে ছিল না পেটে যেটা যেত তারই গুরুত্ব ছিল আমার একমাত্র বিবেচ্য। এখনকার বাচ্চারা শুনি কেউ একটু কিছু বললে চার তলা থেকে ঝাঁপ মারে। সমাজ কি অদ্ভুত ভাবে চলছে ভাবলেই খারাপ লাগে।

আমাদের ছোটবেলাতেও দেখেছি পূজার ক'দিন রোজই বাড়ির বৈঠকখানায় গানের আসর বসতে। যাঁরা আসতেন তাদের মধ্যে সানি বৌদির আত্মীয় গোপাল দা ছাড়া কাউকেই এখন মনে পড়ে না। অঞ্জুদি, অনিমাদি সন্ধ্যাদি তিন জনেই অসাধারণ গান গাইতে পারত তবে তারা কেউই পূজার সময় আসর বসিয়ে গাইত না। বুদ্ধুদা বা খোকাদাও না। তবে আমাদের বাড়িতে সারা বছরই গান বাজনা হত তাই আমাদের সকলেরই একটা পরিশীলিত সংগীতবোধ তৈরী হয়ে গেছিল তখন থেকেই। গান শিখলে জমিদারেরও বেশ নাম ডাক হত বলে মনে হয়। আমার বা আমার ভাই সুমিতের কোনও প্রথাগত শিক্ষা না থাকলেও কোথাও গান গাইতে লজ্জা করে

না। আর অলক ও রীতিমত সুন্দর রবীন্দ্র সংগীত গায়। পল্লব ভাল গীটার বাজাত আর গোবলুর দক্ষতা ছিলো নানান রকম বাজনায়। অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি তাই ব্যাপারটা বন্ধ করলুম। এরপর দিদিদের বিয়ে হতে আরম্ভ করল একে একে। কিন্তু পূজার দাপট কমল না। বিবাহিতা দিদিরা প্রত্যেকেই পূজায় আসত। এর মধ্যে সলিলদার বিয়ে হয়ে গেল প্রচণ্ড ধূমধাম করে। বাড়ির এই প্রজন্মের ছেলেদের মধ্যে প্রথম বিয়ে তাই তার ধূমধাম আর আড়ম্বরও ছিল মনে রাখার মত। সলিলদা নিজেকে নাস্তিক বললেও বৌদি অত্যন্ত ভক্তিমতী। পূজার ক'দিন সব সময়েই লালিদির আদেশ অনুযায়ী পুজার নানান কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। বাড়িতে পরের সংযোজন সানি বৌদি। তিনিও পূজার কাজে আত্মনিয়োগ করতেন। ষষ্ঠির দিন থেকেই ঢাকিরা আসত আর পূজার পুরো আমেজ তখন থেকেই পাওয়া যেত। এরপর আস্তে আস্তে বয়স বাড়তে লাগল, শুরু হল স্কুলে যাতায়াত, স্কুলে যাওয়া অবশ্য কিছুদিন আগেই শুরু হয়েছিল কিন্তু তখন কার দিনে শৈশবের স্কুলে যাওয়াটা এখনকার মত কোন একটা বিশেষ ব্যাপার ছিল না। তখন সবার মতই বাড়ির কাছের কোন স্কুলে ভর্ত্তি হতাম। স্কুলে পড়ার চাপ বা অভিভাবকদের বকাবকি কোনটাই বিশেষ ছিল না। যখন পরীক্ষার ফল বেরুত তখন রেজাল্টটা অভিভাবকরা দেখতেন আর আরও ভাল রেজাল্ট করতে বলতেন। এর বেশী চাপ আমরা আমাদের কৈশরের প্রথম দিকে কখনও অনুভব করিনি। যাই হোক্ এই কৈশোর থেকেই পূজার প্রাত্যাহিক অনুষ্ঠানগুলোর বিশেষত্ব গুলো আমাদের নজরে আসতে শুরু করে। প্রথমেই মনে পড়ে, আমাদের পুরোহিত নারায়ণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের কথা। বাবা, জ্যাঠারা তাঁকে নারায়ণ কাকা বলতেন। ওনার পাণ্ডিত্য পূজার নিষ্ঠা বা প্রয়োগ পদ্ধতির ওপর অসীম দখলের বিচার করার ক্ষমতা আমার তখন ছিল না (বা এখনও নেই) কিন্তু দেখতাম ওনার উপর সবার শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। উনি যখন পূজা করতেন তখন সবাই চুপ করে যেত আর পুরো বাড়ির পরিবেশটাও অন্যরকম হয়ে যেত। যখন আরতি করতেন তখন সবাই মুগ্ধ হয়ে যেত আর সারা বাড়ির পরিবেশটাও অন্য রকম হয়ে যেত। ধূপ আর ধূনোর ধোঁয়ায় ঠাকুর দালানের পুরো পরিবেশটাও অলৌকিক হয়ে যেত । অতবড় দালান ভর্তি লোক আবিষ্ট হয়ে যেত পুরো পরিবেশটা স্বর্গীয় অনুভূতির মধ্যে। আমরা যারা সারাদিন নানা দুষ্টমি করে বেড়াতাম তারাও ঐ সময় শান্ত হয়ে যেতাম। নারায়ণ কাকার (বাবাদের মত আমরাও ওনাকে নারায়ণ কাকাই বলতাম) সামনে বাবা জ্যাঠারাও চুপ করে থাকতেন আর মেজ জ্যেঠিমা, মা আর বাড়ির অন্যান্য গুরুজনেরা আধগলা ঘোমটা দিয়ে ওনার পরিচর্যা করতেন। এখন বুঝি ওনার মত ব্যক্তিত্ববান এবং পণ্ডিত পুরোহিত বর্তমান যুগে একেবারেই বিরল। ষষ্ঠীর রাত্রি থেকে নবমীর রাত্রি অবধি সন্ধ্যা আরতি চলত। সকালে আরতি হত তবে সন্ধ্যারতির মত সেটা তত আতর্ষণীয় আমার কাছে লাগত না। বোধনের দিন সকাল থেকেই ভোগ দেওয়া শুরু হত। সপ্তমীর দিন থেকে তার পরিমান অনেকটাই বেড়ে যেত।

বাড়ির লোকেরা ছাড়া 'দেবেনের মার নাতনি' বলে এক বিধবা ভদ্রমহিলাকে দেখতাম অক্লান্ত ভাবে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে। পরে আমাদের এক জ্ঞাতির স্ত্রী, 'লালুকাকার বউ' ও আসতেন ভোগ রাঁধতে। সকালে ভোগ রাঁধা শেষ হলে হত সকালরে আরতি এবং সবার পরে অঞ্জলি। আমরা ছোটরাও সবাই স্নান করে, খালিপেটে অঞ্জলি দিতাম আর তারপর গরম ভাদুয়া ঘিয়ের লুচি আর মিষ্টি দিয়ে শুরু হত উপবাস ভঙ্গ। খাওয়া দাওয়া শেষ হলেই শুরু হতে দৌড়ঝাঁপ। কয়েক বছর না থেকে আমাদের দলে আসতে থাকে সোমনাথ, বাপ্পা আর পুলকেরা। আমরা বড়রা ওদেরকে নিতাম নিতান্ত খেলার প্রয়োজনে অন্য সময়ে আমরা বড়ত্ব বজায় রাখতাম। দশমীর দিন আবার অঞ্জলি শুরু হত বেড়া অঞ্জলি দিয়ে—তখন বড়র থেকে ছোটরা পরপর সবাই লাইন দিয়ে মাতৃপ্রতিমাকে প্রদক্ষীণ করতাম। তারপর পুরোহিত মশাই মাতৃপ্রতিমার বিসর্জনের অনুষ্ঠান পালন করতেন। পূজার অনুষ্ঠানে সমাপ্তি হলে — শুরু হত কাদামাটি খেলা। পাড়ার সব ছেলেরা কাদামাটি মেখে নাচতে নাচতে আসতো এবং এক পূজা বাড়ি থেকে অন্য পূজার বাড়িতে ঢাকি সমেত চলে যেত। আমাদের উঠোনে সবাই নাচত — আর হরিদা, সমীরদারা তাদের গায়ে বালতির পর বালতি জল ঢালত। এই দলটাকে পরিচালনা করত পাশের বাড়ির দিলীপদা আর আমাদের অন্য এক জ্ঞাতি ভাই জনুদা। আমরা যেহেতু, জমিদার বাড়ির ছেলে তাই ইচ্ছে থাকলেও কাদামাটি খেলার দলে যেতে পারতাম না। যারা খেলতে আসত তাদের প্রত্যেককে মিষ্টি দেওয়া হত নাচ শেষ হয়ে গেলে। তারপর তারা ঢাকিদের নিয়ে পরের পূজা বাড়িতে চলে যেত।

দুপুরে হত মা দুর্গার বরণ। বাড়ির বউরা পালা করে খুব সেজে গুজে দুপুরে মা দুর্গার বরণ করত। এরপর হোতো ঠাকুর বিসর্জনের প্রস্তুতি। বিকালবেলা বিরাট লরি আসত। বাড়ির প্রতিমা লরিতে তোলার জন্য আমাদের উড়িয়া প্রজাদের ডেকে আনা হত। তাদের সঙ্গে দাদারা হাত মিলিয়ে নানা কসরৎ করে প্রতিমাকে লরিতে তুলতেন। তারপর বাড়ির

সবাইকে কাঁদিয়ে মা দুর্গা শ্বশুর বাড়ি রওনা দিতেন। গঙ্গায় গিয়ে আরেকদফা কসরৎ করে প্রতিমাকে লরি থেকে নামিয়ে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হত। হরিদা খুব ভাল সাঁতার কাটতে পারত, চেহারাও ছিল মজবুত —দেখতাম বিসর্জনের পর একাই প্রতিমা কাঠামোকে প্রায় গঙ্গার মাঝামাঝি পর্য্যন্ত নিয়ে গিয়ে আবার সাঁতরে আমাদের কাছে চলে আসতে।

লেখার মেজাজে অনেক দূর চলে আসার পর আমার দুটো বিশেষ অনুষ্ঠানের কথা মনে পড়ল। একটা হল কুমারী পূজা। অষ্টমী দিন সকাল বেলা দেখতাম একটা বাচ্চা মেয়ের মধ্যে দেবীত্ব অরোপ করা হত। অনুষ্ঠানটার নাম 'কুমারী পূজা'। বাড়ির বৌয়েরা দেখতাম অনুষ্ঠানের পর তাকে প্রণাম করত। আর অন্য একটা ছিল অত্যন্ত মনোগ্রাহী অনুষ্ঠান যেটা পালিত হত অষ্টমী ও নবমীর সন্ধি লগ্নে—'সন্ধিপূজা'। সমগ্র ঠাকুর দালানের সিঁড়িতে একশো আটটা প্রদীপ জ্বালানো হত। দালানের উপরে একটা বিরাট থালায় একটা বিশাল বারকোসে (থালায়) প্রচুর চাল দেওয়া থাকত আর তার উপর থাকত নানান ধরনের ফল। পুরোহিত মশায় যখন পূজা করতেন তখন সমগ্র বাড়িটা যথা সম্ভব আলোকিত করা হত। এর সঙ্গে চলত আরতি। আমি তখন এর থেকে বেশী কিছু বুঝতাম না কিন্তু পুরো অনুষ্ঠানটার একটা আমেজ মনের মধ্যে এক বছর ধরে গাঁথা থাকত।

আমি আস্তে আস্তে বড় হতে লাগলাম। শৈশব থেকে এলাম কৈশোরে। ইতিমধ্যে ঠাকুর দালানের দখলটা আস্তে চলে যেতে শুরু করল সোমনাথ, দেবু, ছট্টু, সুমিত, বাপ্পা, রাণা, বাচ্ছি আর পুলকদের হাতে। রঞ্জন পুজোর সময় খুব একটা থাকত বলে মনে পড়ে না। খুকুদি আর টুলু পুজোর কাজ গুলোর মধ্যে ঢুকে পড়ত আর আমি অলক পল্লবরা একটু অন্যরকম ভাবে ব্যস্ত থাকতাম। ১০-১২ বছর অবধি পূজাটা এই ভাবেই কাটল। তারপরেরটা অন্য গল্প।

কিছুটা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীরাও বাড়তে শুরু করল— তবে বাড়িতে নয় পাড়ায় আর পরীক্ষা, পড়াশুনার গুরুত্বটাও বাড়তে শুরু করল। আমার বড়দা অর্থাৎ, সলিলদা ইতিমধ্যে সংসারের হাল যেমন ধরে নিল তেমনি এক কড়া অভিভাবক রূপেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল। আমার ঠাকুরমার এক ভাই "ছোড় দাদু" নীচে বসে নিজের কাজকর্ম করতেন আর আমাদের গতিবিধির নজর রাখতেন। কখন বেরুচ্ছি কখন ফিরছি তার রিপোর্ট সবই তাঁর মারফৎ বড়দার কাছে পৌঁছে যেত—একটু বেনিয়ম হলে তার প্রতিবিধানও এক রকম হত। তবে আমরা সবসময়ই আড্ডা আর পড়াশুনার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রেখে চলতাম। যাই হোক্ আগে যেমন আমাদের কাছে পূজাটা শুধুমাত্র একটা আনন্দের উৎসব ছিল বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার রঙ একটু একটু করে পাল্টে যাচ্ছিল তার প্রধান কারণ পূজা সাঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাৎসরিক পরীক্ষার দুশ্চিন্তা শুরু হয়ে যেত কারণ তখন পুজোর দু'একমাস পরেই পরীক্ষা শুরু হত যা ছিল প্রত্যেক ছাত্রের কাছে একটা ইজ্জত রক্ষার ব্যাপার। দেখতে দেখতে বড় হয়ে যেতে লাগলাম আর ঠাকুর দালানের দখলদারি এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের

হাতে চলে যেতে দেখলাম। এবার চলে এ'ল শর্মিলা, কেয়া, ফিলিপ, নাদু, ঝর্ণা, কাবেরিরা। এরপর এল মুনমুন, শোভন রুপুনদের দল। ঠাকুর দেখার জন্য শ্যামবাজার থেকে বালীগঞ্জ অবধি কখনই দৌড়তাম না। পাড়ার বাইরে ঠাকুর দেখা বলতে কলেজ স্কোয়ার আর ফায়ার ব্রিগেড।

১৯৬৪ সালে কলেজে ঢুকলাম— তখন ও রীতিমত বড় হয়ে গেছি। বুঝতে পারতাম পূজার জৌলুস একটু যেন ম্রিয়মান। এরপর সলিলদা বম্বেতে বদলি হয়ে গেল। মেজদার ঘাড়ে পূজাটা চলে এল। কিছুদিন বাদে মেজদার বিয়ে হয়ে গেল। তারপর মেজদাও বদলি হয়ে গেল শিলিগুড়িতে আর পূজার দায়িত্ব চলে এল আমার কাধে। আমি আমার সীমিত সামর্থ নিয়েও পূজার সব দায়িত্বই পালন করেছি। কিভাবে করেছি তার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী মা আজ পরলোকে। তবে বাস্তব ঘটনা হল আমার কাছে পুজার রঙটা অনেক ফিকে হয়ে গেছিল।

এখন পূজাটার প্রধান দায়ীত্বে মুনমুন, বুড়ো আর চিকু। বর্তমান প্রজন্ম পুজোর পুরানো জৌলুস ফিরিয়ে আনায় বদ্ধপরিকর, নেতৃত্বে অবশ্যই মুনমুন। আমরা অর্থাৎ আগের প্রজন্মের প্রতিনিধিরা কেউ কেউ আছি—অনেকেই নেই। যখন প্রতিবছর পূজা আসে তখন সবাই সম্মিলিত হই-এ চার পাঁচ দিন বড়ই আনন্দে কাটে। বাড়িতে গেলেই অতীতের অজস্র স্মৃতি ঘিরে ধরে দুঃখেরগুলো মনে থাকে না। সুখের দিন গুলোই ধরে রাখি। মা, মেজজ্যাঠাইমার হাত থেকে পূজোটা দিদিদের হাতে গেছিল।—তার থেকে গৌরীবৌদি, বৌদি, সানিবৌদি, ঋতাবৌদি, মেজবৌদি, বনানী, সর্বাণী, সুমিতা বৌদি, কৃষ্ণাদের হাতে চলে এসেছিল তারা নিষ্টাভরে চেষ্টা করেছে যাতে পূজাটার যাবতীয় ঐতিহ্য বজায় থাকে। বর্তমান প্রজন্মের একে সংখ্যায় অনেক কমে গেছে তার উপর বেশীর ভাগই ভবিষ্যতের অনুসন্ধানে দেশের বাইরে—দেখা যাক কি হয় ঐ তার দেবীর শক্তি দুর্বার—যদি তিনি আসবেন মনস্থ করেন তা প্রতিহত করার শক্তি কারুর নেই—হয়ত আরও সহস্র বছর ধরেই দেবী আমাদের বাড়িতে আসবেন—শুধু আমরাই তখন থাকব না।

কলা বৌ

সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁধিলা পত্রিকা নব বৃক্ষের বিলাস ঃ

একবার শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই দানব দেবতাদের আতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এমনকী তারা স্বর্গ অধিকার করে সেখান থেকে দেবতাদের তাড়িয়ে দিল। এর থেকে রক্ষা পেতে দেবতারা দেবী মহামায়ার স্তব করতে লাগলেন। সেই স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে দেবী মহামায়া নিজের শরীরের অংশ থেকে কৌশিকী নামে এক দেবীকে সৃষ্টি করলেন। অপূর্ব তার রূপ। সেই রূপ দেখে শুম্ভ এবং নিশুম্ভ দুজনেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তারা দুজনেই চাইলেন দেবীকে বিয়ে করতে। তাই তারা সুগ্রীব নামে একজন দানবকে দূত করে পাঠাল দেবীর কাছে। তার কাছ থেকে শুম্ভ নিশুম্ভবের প্রস্তাব শুনে দেবী বললেন, 'আমাকে বিয়ে করার আগে যুদ্ধে আমাকে হারাতে হবে। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, যে আমাকে যুদ্ধে হারাতে পারবে, আমি তাকেই বিয়ে করব। সুগ্রীবের মুখে একথা শুনে শুম্ভ ও নিশুম্ভ রুষ্ট হল। তারা তাদের সেনাপতি ধ্রুম্রলোচনকে পাঠাল দেবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। ধ্রুম্রলোচন হাজার হাজার সেনা নিয়ে এল দেবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে। কিন্তু দেবীর সঙ্গে যুদ্ধে তারা পরাস্ত হল। মুখ থেকে অগ্নি উদগীরণ করে দেবী ধ্রুম্রলোচনকে পুড়িয়ে মারলেন। দেবীর বাহন সিংহের আক্রমণে সব সৈন্যসামন্ত পালিয়ে গেল। এ খবর পেয়ে আরও রুষ্ট হল শুম্ভ ও নিশুম্ভ, তারা দেবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠাল চন্ড-মুন্ডকে। বলল, যেভাবেই হোক ওই মোহময়ী নারীকে ধরে আনতেই হবে।

চন্ড-মুন্ডকে দেখে দেবী কালীরূপ ধারণ করলেন ও

খড়্গ দিয়ে দেবী চণ্ডমুন্ডকে বধ করলেন। এরপর দেবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠানো হল রক্তবীজকে। রক্তবীজ এমন এক অসুর যাকে সহজে বিনাশ করা যায় না। রক্তবীজের শরীর থেকে যত ফোঁটা রক্তবিন্দু মাটিতে পড়বে, ততগুলি দৈত্যের জন্ম হবে। দেবী তাই রক্তবীজকে অন্যভাবে বধ করলেন। তাকে শুলবিদ্ধ করে তার সমস্ত রক্ত পান করে নিলেন, যাতে এক ফোঁটা রক্তও মাটিতে না পড়ে। এরপর নিশুম্ভ যুদ্ধে এলে তাকে দেবী খড়্গ দিয়ে বধ করলেন। তারপর এলেন শুম্ভ। তাকে দেবী শূল দ্বারা বিদ্ধ করে হত্যা করলেন। শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করতে গিয়ে নানা সময়ে দেবীকে নয়টি রূপ ধারণ করতে হয়েছিল। দেবীর এই নয়টি রূপ প্রতীক হিসাবে প্রকাশ পায় নবপত্রিকায়। কলাবউকেই নবপত্রিকা বলে। এখানে শুধু কলাগাছই নয়। একই সঙ্গে থাকে, 'কচ্চি কচু) হরিদ্রা চ" জয়ন্তী, বিশ্বাদাড়িম্ব, অশোকমানকশৈচব ধান্যশ্চ নবপত্রিকা।" অর্থাৎ কলাগাছের সঙ্গে থাকে কচু, হলুদ, জয়ত্রী, বেল, ডালিম, অশোক, মানকচু, ধান।

বৃক্ষপূজার প্রচলন বৈদিক যুগ থেকেই। প্রকৃতি আমাদের কাছে ঈশ্বরের মতো। সেই প্রকৃতির প্রতীক হল বৃক্ষ। বৃক্ষ পূজাই হল মাতৃপূজা। এই নয়টি পত্রিকার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত নয়টি দেবতা। কলায় ব্রাহ্মণী, কচুতে বালিকা, হলুদে দুর্গা, জয়ন্তীতে কার্তিক, বেলে শিব, ডালিমে রক্তদন্তিকা, অশোকে শোকরহিতা, মানকচুতে চামুন্ডা এবং ধান্যবৃক্ষে লক্ষ্মীর অবস্থান। সব মিলিয়ে এই নবপত্রিকাকে 'কুলবৃক্ষ'ও বলা হয়। রায়বাহাদুর রামপ্রসাদ চন্দ তার "ইন্ডো এরিয়ান রেসেস" বইতে নবপত্রিকাকে "কুলবৃক্ষ" হিসাবেই চিহ্নিত করেছেন।

অনুমান—এই যে নবপত্রিকা, এর মধ্যে বাস করেন কুলযোগিনীরা। তারা হয় দেবীর লীলাসঙ্গী, আর না হয়, স্বযং দেবী। তাই কলাবউ বা নবপত্রিকার পুজো মানে নয়টি বৃক্ষকে সম্মিলিতভাবে পুজো করা।

এই বৃক্ষপুজোর সঙ্গে আমাদের কৃষি ও শস্য উৎপাদনের নিবিড় যোগ আছে। একথা বলেছেন ড. শশিভূষণ দাশগুপ্তও। রামায়ণেও আমরা নবপত্রিকার কথা পাই। "বাঁধিলা পত্রিকা নব বৃক্ষের বিলাস"। রামচন্দ্রের অকালবোধন প্রসঙ্গে লিখেছিলেন কবি কৃত্তিবাস ওঝা। তাই শক্তি আরাধনার সঙ্গে আমাদের শস্য উৎপাদন, প্রকৃতির প্রতি আমাদের নিবেদন সব একাকার হয়ে মিশে গিয়েছে।

গৃহবধূর চোখে ১২৫ বছরের দুর্গাপূজো

সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

কোনও দিনই খাতা পেনসিল নিয়ে কিছু লেখার কথা মনে হয়নি। আজ প্রথম ভাবলাম পটুয়াটোলার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের দুর্গাপুজা ১২৯ বছর পার হয়ে ১৩০ এ পড়ল, তখন বউ হিসাবে আমার কিছু অভিজ্ঞতা পাঠকের কাছে জানানো কর্তব্য। অনেক ছোট বয়সেই এই বাড়ীতে বউ হয়ে এসেছি। তখন চোখে ছিল অনেক স্বপ্ন, ভাললাগা, আশা আকাঙ্খা, আর যেটা ছিল অপার বিস্ময় তা হল এই প্রাসাদোপম অট্টালিকার ঠাকুর দালান, যেখানে বহু যুগ ধরে মহা সমারোহে দুর্গাপুজা হয়ে আসছে।

সাধারণ ঘরের মেয়ে ছিলাম। জানতাম শুধু বারমেসে লক্ষ্মীপুজো, সত্যনারায়ণ ব্রত আর বই খাতা ঘট বসিয়ে সরস্বতী পুজো। তবে এ স্বল্প পুজোর মধ্যেই জানা ছিল মা, ঠাকুমার কাছে শেখা পুজো নিষ্ঠা। এক সাধারণ ঘরের মেয়ে যখন এতবড় ঘরের গৃহবধূ রূপে এসে রাজসূয় যজ্ঞসম দুর্গাপুজো দেখলাম যার এত আয়োজন, এত আড়ম্বর তখন তার ভেতর এক বিরাট বিস্ময় জেগে উঠেছিল। দূর থেকে সে সেই আড়ম্বর দেখতো আর ভাবতো কবে সেও এই পুজোর সঙ্গে নিজেকে এক করে ফেলতে পারবে।

তখন নতুন বউদের কাজ ছিল পুজোর চারদিন বসে বেলপাতার মালা গাথা। তাতেই তার পুজোর কাজ সারা হয়ে যেত। অবশ্য আরও একটা বড় কাজ ছিল বিয়ের প্রথম বছর মা দুর্গাকে বরণ করা ও কনকাঞ্জলি নিয়ে ঘরে ফেরা এ যেন একটা বিরাট আনন্দ। মার কানে কানে বলা "মা তুমি আবার এসো" এর মধ্যে হয়ত আন্তরিক আকুতি ছিল, তা না থাকলে মা দুর্গা বছর বছর আমাদের পরিত্রাতা হয়ে এসে আমাদের ঠাকুরদালান অলংকৃত করতেন না। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আমি খুবই সৌভাগ্যবতী।

সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মা শতবর্ষে পা দিলেন আমাদের বাড়ীতে। বাড়ীর সবাই যেন আনন্দের জোয়ারে ভেসে গেল। নতুন উদ্যমে সবাই লেগে পড়ল মায়ের কাজে। কত নতুন নতুন পরিকল্পনা, সাজসজ্জা, আনন্দ অনুষ্ঠানে দিন গুলো ভরে গেল। এখন নিজেকে আমি অনেকটা এই বাড়ীর মত করে মানিয়ে নিতে পেরেছি।

এখন পুজোর মধ্যে পরের প্রজন্মের কিছুটা হলেও দায়িত্ব এসে পড়েছে, যার প্রভাবে আধুনিকতার ছোঁয়া কিছুটা হলেও লেগেছে। তবে পুজোর নিয়ম নিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোনও আধুনিকতা স্পর্শ করতে পারেনি তাতে সাবেকীয়ানা পুরোমাত্রায় বজায় থেকেছে। নানানরকম সাজসজ্জা আনন্দ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শতবর্ষ পালন হয়েছে যা পরিকল্পিত হয় প্রাক্ শতবর্ষ থেকেই। সেই সময় মায়ের আগমনী গান, টপ্পা ইত্যাদি যার কণ্ঠ

চর্তুদিকে মুখরিত হত তিনি হলেন শ্রী রামকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, তিনি উপস্থিত থেকে আমাদের ঠাকুরদালান মাতিয়ে দিয়ে গেছিলেন। এছাড়াও ছিল কবিতা, নাচ ও গানের অনুষ্ঠান। বাড়ীর সব ছোট বড় সদস্যরা মিলে, এমনকি আমরাও এইসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতাম। তবে একটা মজার কথা বলি, যেটা আমার খুব ভাল লাগত আমাদের শাশুড়ি মায়েরা আগেকার দিনের মানুষ হয়েও খুবই আধুনিক ছিলেন। তারা এইসব অনুষ্ঠানগুলি খুবই উপভোগ করতেন এবং খুবই উৎসাহিত করতেন নাতি, নাতনি, নাতবৌ এমনকি আমাদেরও।

এরপর পুজো শতবর্ষ পার করে ১২৫ বছরে পা দিতে চলল। আর সেই আমি কখন যে বোধন ঘর, ঠাকুরদালান রান্নাঘর ইত্যাদির সাথে একাকার হয়ে গেলাম তা বুঝতেই পারিনি। এখন অনেক কিছু শিখেছি, জেনেছি। এখন এ ছোট মেয়েটির চোখের বিস্ময় পুরোপুরি কেটে গিয়ে বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

এখন পুজো আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গিয়ে আমার বাড়ীর পুজো হয়ে গেছে, প্রতিটি নিয়মকানুন এখন আমার অন্তরে গেঁথে গেছে। এখন সেই ছোট্ট মেয়েটি পুরোপুরি পটুয়াটোলার গৃহবধূ হিসাবে নিজেকে মেলে ধরতে পেরেছে। তবে একটা কথা না বললেই নয়, এইসব নিয়মনিষ্ঠা শেখানোর পেছনে সব কৃতিত্বই আমার শাশুড়ি মা, মেজ জ্যাঠশাশুড়ি, মাতৃসমাননদের আর আমার বড় বড় জায়েদের। তারা পাশে না থাকলে আমার এই শিক্ষা সম্ভব হতো না। আরও একজনের কথা না বললে আমার কাছে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তিনি হলেন আমাদের "ছোড়দা"। এক সময় তিনি ছিলেন এই পুজোর মধ্যমণি। আজ তিনি নেই, তাই লিখতে বসে তার কথা খুবই মনে পড়ছে। আরও একটা মনে হয় এই পুজোর কটাদিন যেন আমাদের কাছে একটা নতুন বার্তা বহন করে আনে। আমরা সব দুঃখ, বিবাদ ভুলে গিয়ে একে অপরের সাথে এক হয়ে যাই। আমরা সারাবছর ধরে অপেক্ষা করে থাকি মা কবে আসবে। সবই মায়ের অপার মহিমা। সর্বোপরি বলি, বাড়ির সকল সদস্য আমার স্বামী সন্তান ও সন্তানসম সবাইকার আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই পুজো ১৩০ বছর সাড়ম্বরে পদার্পণ করল। তার জন্য আমি খুবই গর্বিত। মায়ের এই মহিমা সংসারের ছোট থেকে বড় সবাইকার ওপর বর্ষিত হোক এই কামনা করি।

বিনোদ বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়

বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক মাত্র পুত্র ছিলেন বিনোদ বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি মাত্র আট বছর বয়সে তার পিতাকে হারান। তার মা শ্যামাকালী দেবী আগেই গত হয়েছিলেন। মীরা রাণী নামে এক বোন ছিল। এছাড়া তার এক সৎমা ছিলেন; যার বয়স মাত্র পনোরো বৎসর নাম হেমাঙ্গিনী দেবী।

বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় এক অজানা রোগে দীর্ঘ দিন ভুগে মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে মারা যান। তখনকার বিখ্যাত সাহেব ডাক্তারও রোগ নির্ণয় করতে পারেননি। মারা যাবার আগে তিনি একটি উইল করে যান। সেই উইল অনুসারে বিনোদ বিহারী আঠারো বৎসর বয়স হলেই এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারি হবেন। ততদিন বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় Executor হিসাবে এই সম্পত্তি দেখাশুনা করবেন।

বিনোদ বিহারী সম্পত্তির অধিকারী হবার পর খুব দক্ষ হাতে সম্পত্তির দেখাশুনা করেন। তিনি কলকাতা শহরে বেশ কয়েকটা বাড়ীও কেনেন। তার ইউরোপীয় স্থাপত্তবিদ্যার উপর খুব আগ্রহ ছিলো। এই বাড়ীগুলোকে তিনি সেই মতন স্থাপত্ত দেন। নিউ মার্কেট-এর উল্টো দিকে অবস্থিত দশ নম্বর লিন্ডেসে স্ট্রীট বাড়ী তৎকালীন আধুনিক ভাবে গড়ে তোলেন। নাইটিঙ্গেল হাসপাতাল-এর বিপরীতে একশ পাঁচ নম্বর সেক্সপিয়ার সরণীতে একটি সাহেবি ঢং-এর বাড়ী নির্মাণ করেন তাতে পরটিকো ছিলো। বাড়ীর সামনের দিকে ছিলো সুন্দর বাগান। তিনি আরও একটি বাড়ি কেনেন ১১৭ রিপন স্ট্রিটে। সেখানে সিঁড়ি ছিলো কাঠের। তিনি এই বাড়িটিকে তখনকার হিসেবে খুব আধুনিক ভাবে তৈরি করেন। মেঝেতে মোজাইক বসান ঝিনুক দিয়ে। জানলায় ventilation system রাখেন। পশ্চিম দিকের ঘর এ রঙীন কাঁচের জানলা করেন। তাতে পরন্ত বিকেলে ঘরে রঙীন আলো পড়ে। সিঁড়িতে ছিলো carpet বিছানো ও প্রতিটা ঘরের সঙ্গে attached bathroom করেন এবং তাতে Bath Tub ও বসান।

তিনি ১৮৯০ সালে নিজের বসবাসের জন্যে বাড়ীর পাশেই একটি চক্ মেলানো বাড়ী তৈরি করেন। দু মহলা সেই বাড়ী আজও তার নির্মাণ শৈলির বার্তা বহন করে চলেছে। বাড়ীটি ইংরাজ স্থাপত্য Gothic Style এ তৈরি যা সেই সময় আবার ইউরোপে গৃহ নির্মাণ তৈরি শৈলীতে ফিরে এসেছিলো। বাড়ীর জন্যে Marble আনেন Italy থেকে। উনি একতলার সব ঘরের বিমগুলো কাঠের বদলে লোহা দিয়ে করেন Britain থেকে লোহার বিম Import করান। কারণ সেই সময় কাঠের বিম এর ব্যবহার কমে আসছিলো। তিনি দশ কাঠার ওপর এই বাড়ীটি তৈরি করেন মাত্র দু বছরে।

বিনোদ বিহারী খুব সাধারণ জীবনজাপন করতেন। তাই দুই পুত্র ও দুই কন্যা ছিলো। পুত্রদয়ের নাম যথাক্রমে বিশ্বরঞ্জন ও সতীরঞ্জন কন্যাদয়ের নাম রাজকুমারী ও শরৎকুমারী দেবী। ইনিও তার পিতার মতো স্বল্প আয়ু ছিলেন। তিনি মাত্র ৪৩ বছর বয়সে মারা যান।

আমার ছেলেবেলা

অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়

দূর্গাপুজোর প্রথম যে দৃশ্যটা আজো আমার মনে অমলিন ভাবেই রয়ে গেছে সেটা হলো একটা বৃষ্টি ভেজা সকাল — সালটা ঠিক মনে নেই, আমাদের রকের ধারে একটা লরি দাঁড়িয়ে আছে আর তাতেই প্লাস্টিক মোড়া একটা বিশাল বড় অসম্পূর্ণ দূর্গা প্রতিমা—মাটির ওপর স্রেফ সাদা চুনের একটা প্রলেপ। আমরা তখন খুব ছোট—উত্তেজনা ও উৎসাহের কোনো শেষ নেই। একবার রক থেকে লাফ দিয়ে লরি আর পরক্ষণেই লরি থেকে লাফ মেরে রকে, এই আমার দুর্গা পুজোর প্রথম স্মৃতি। আর হ্যাঁ এটাও মনে আছে যে ঠিক সেই সময় নদা (ন জ্যাঠা) আমাদের খুব বকছিল আর চিৎকার করছিল "পতাই, পতাই, মারব, মারব মারব এক চড়"... কিন্তু কে শোনে কার কথা—সব হুঙ্কার, ভর্ৎসনা খড় কুটোর মতো উড়ে যাচ্ছিল আমাদের আনন্দের আতিসয্যে। তারপরের যে চিত্রটা মনের বায়োস্কোপে ভেসে আসে সেটা হলো বিসর্জনের। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেতে দেখি আমাদের দিকটা একদম ফাকা কেউ কোথাও নেই, মাকে খুঁজতে খুঁজতে লাল দালান থেকে পাথর দালান হয়ে যখন কাঠের বারান্দায় পৌঁছলাম তখন দেখি সেখানে ঠাকুমা বসে আছে আর মন দিয়ে রাস্তায় কি যেন দেখছে। এইটুকু মনে আছে যে আমি তখন খুব ছোট আর আমাকে দেখেই ঠাকুমা বলছিল যে "দেখো ঠাকুর ভাসানে যাচ্ছে, তুমি যাবে না?" তারপর খুব একটা ভালো মনে নেই—সম্ভবত ঠাকুমা কাউকে ডেকে বলেছিল আমাকে নিয়ে যেতে কিন্তু কে ঠিক মনে নেই, কারুর একটা হাত ধরে আমি লরিতে উঠে পড়েছিলাম। তারপর কিন্তু অনেক জল গঙ্গায় বয়ে গেছে, অনেক শীত গ্রীষ্ম বর্ষা পেরিয়ে গেছে কিন্তু এই দুটো দৃশ্য আজও অমলিন — একটা শুরুর আর একটা শেষের।

বাড়ীর পুজোর মানেটা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে একেকটা নতুন লক্ষ্য বা মাত্রা পেয়েছে—খুব ছোটবেলায় পুজো ছিল শুধু পুজোর মধ্যেই আবধ্য—মা দুর্গা, অসুর, সিংহ, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ইঁদুর, পেচা, ময়ূর, হাঁস ইত্যাদি জগৎ—তাদের মধ্যে বাধ সাধত পণ্ডিত মশাই—নানারকম বিধান দিত—উপায় না থাকলেও মেনে নিতে হত। তার অবশ্য কারণ ছিল —বুড়ো যখন দেখত ভগবান ভূত ইত্যাদি দিয়ে হচ্ছে না তখন ওর কাকা এবং জ্যাঠাদের আসরে নামাতো আর তাতেই আমরা গুটিয়ে যেতাম। না বুঝে মন্ত্র আওড়ানো, দাঁতে দাঁত চেপে উপোস করা, পুজোর কাজ করা ঠাকুমাদের সাথে—এইসব ছিল উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সবকিছুই বাড়ির মধ্যে আবধ্য। যখন আর একটু বড় হলাম, সাহস একটু বাড়লো, ভয় কমল আর বাইরের প্রলোভনটাও আর উপেক্ষা করা গেল

না, তখন মনে হত কতক্ষণে ঠাকুর দেখতে যাব, কলেজ স্কোয়ারে গিয়ে ফুচকা খাবো, তারপরে চপ কাটলেট রোল ইত্যাদি খাবো।

শেষমেষ এমন জায়গায় দাঁড়ালো, যে একবার তো, সালটা ১৯৮৩, দুপুরবেলায় বাড়ি ফিরলাম কফিহাউস থেকে কড়া টোস্ট সহযোগে চিকেন আফগানী খেয়ে। মা বলল, "ওরে তাড়াতাড়ি খেয়ে নে, সন্ধ্যি পুজো শুরু হবে একটু পরেই" যেই না বলেছি আমি খেয়ে এসেছি মা তো আমাকে এই মারে তো সেই মারে, সে যাত্রায় ঠাকুমা বাঁচিয়ে দিয়েছিল। ঠাকুমা বলেছিল, "ও ছেলে মানুষ না বুঝে করেছে, যে দিন বুঝতে পারবে, সেদিন আর করবে না"—কথাটা তখন বুঝিনি কিন্তু যখন বুঝেছিলাম তখন ঠাকুমা আর নেই, আজও কিন্তু বাড়ির বাইরে কিছু খাওয়ার কথা চিন্তাও করতে পারি না পূজার দিন কটায়। এক সময় নিজের সাথে রীতিমতো যুদ্ধ করে রোল-চপ-কাটলেট ইত্যাদির মায়া কাটাতে হতো কিন্তু এখন সম্পূর্ণ অন্য চিত্র।

ঠাকুর দেখতে যাওয়ার একটা ধুম ছিল বটে স্বাভাবিক কারণে— বাড়ির কার্যত ত্রিসীমানায় তিনটি বিখ্যাত পুজো হয় কলেজ স্কোয়ার, মহম্মদ আলি পার্ক আর লেবুতলা—যেগুলো বাড়ি থেকে দুপা ফেলে দেখে আসা যায়—কিন্তু তাতে কি আর মন ভরে? শুনেছি দক্ষিণে আরও বড় পুজো হয় যেমন একডালিয়া এভারগ্রীন, বালিগঞ্জ কালচারাল, সমাজসেবী, ২৩ পল্লী, হাজরা ইত্যাদি, কিন্তু নিয়ে যাবেটা কে? এই প্রসঙ্গে বলি যে বিয়ের পরে প্রথম বারের পুজোয় আমার সহবধর্মিনী ভেবেছিল যে সে উত্তর কলকাতায় অনেক ঠাকুর দেখতে পাবে বিশেষ করে যেগুলো বিয়ের আগে দেখেনি। মজার কথা এই যে আজও তার একটা দেখা হয়ে ওঠেনি, প্রথমদিকে হয়ত একটা চাপা অনুযোগ বা আক্ষেপ ছিল কিন্তু এখন তার পুজো বলতে শুধুই তার শ্বশুরবাড়ির পুজো। ফিরে আসি আমাদের ঠাকুর দেখার গল্পে—তখন বাড়ির কোনো এক গুরুজনের সাথে ঠাকুর দেখতে যাওয়াই রীতি ছিল কারণ "রাস্তায় ছেলেধরা আছে"। বাপিকে বল্লে বড়জোর কলেজ স্কোয়ার আর তার থেকে একটু দূরে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার পুজো — তার বেশি নয়, কিন্তু তা বললে কি করে হবে—পুজোর পর স্কুল খুললে মুখ দেখাবো কি করে যদি ওইসব বিখ্যাত ঠাকুর অদেখাই রয়ে গেল, তাই এই ক্লাস সেভেন-এইট অবধি যা হোক করে কাটিয়েছি এই ভেবে যে আর তো একটা কি দুটো বছর তারপর তো দল বেধে ঠাকুর দেখতে যাব। তারপর যখন আমাদের অনুমতি দেওয়া হলো কাছেপিঠে বন্ধুরা বা ভাইরা মিলে যাওয়ার তখন আর আমাদের পায় কে। নিজেরাই ফন্দি এঁটে ঠিক করলাম কি করে ওইসব দূরের ঠাকুর দেখতে যাওয়া যায়। বাড়িতে বললাম কলেজ স্কোয়ার দেখতে যাচ্ছি আর বলে চলে যেতাম দক্ষিণে। রাত নটা দশটা নাগাদ ফিরতাম আর মা জিজ্ঞেস করলে বলতাম "কত বড় লাইন তুমি জানো মা"। মা হয়তো সন্দেহ করত কিন্তু প্রমাণ এবং সাক্ষীর অভাবে বেকসুরখ খালাস পেয়ে যেতাম। ছেলেধরার ভয় দেখিয়ে ছেড়ে দিত কিন্তু ছেলেধরার ভয় মা-ঠাকুমারা পেতো কিন্তু

আমরা নয়। সত্যি বলতে কী স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, আমাদের যে ভয় একদম করত না তা নয় তবে বয়সটাই তো দুঃসাহসের — আমরা তার ব্যতিক্রম হব কি করে, কিন্তু মজার কথা এই যে যখন আরো দূরে যেতে সাহস বা দুঃসাহস কিছুই লাগত না তখন কিন্তু মনটা একদম বাড়ির বাইরে বেরোতেই চাইতো না। ভাল লাগতো বাড়িতে আসর জমাতে। পুজোর সময় আমাদের ভাইবোনের যারা বিদেশে থাকে তারা আসে আর যারা একেবারেই অপারগ তারা ফোন, ইন্টারনেট ইত্যাদি দূরভাষের মাধ্যমে দুধের সাধ ঘোলে মেটায়। একই কথা খানাপিনার ক্ষেত্রে। দিলখুশ, মিনি, রয়াল, আলিয়া, চাং ওয়া — না কেউ পারে না আমাদের মা কাকিমা - জ্যেঠিমাদের রান্না করা পোলাও আর খিচুরীকে টেক্কা দিতে পুজোর ঐ কটা দিন — তাই তাদের প্রবেশ ঠাকুর বিসর্জনের পরে, ছোটোবেলায় কী আর জিভ লকলক করেনি? খুব করেছে এবং মা ঠাকুমার কাছে মিথ্যে কথাও বলেছি পুজোর মধ্যে বাড়িতে একদম প্রবেশ নিষেধ এবং বাইরে গিয়ে খাওয়ার প্রশ্ন নেই। জেঠুমুনি প্যারামাউন্টের সরবত নিয়ে আসতো এবং সেটাই একমাত্র বাইরের খাবার যেটা আমরা খেতাম আর এখন সেই কাজ টা করে বাচ্চিদা — সব কচিকাচাদের জন্য সরবত সাপ্লাই দেয় পুজোর মধ্যে — নরানাং মাতুলক্রম।

ছোটবেলার সাথে এখনকার পুজোর মধ্যে একটা পার্থক্য কিন্তু খুবই চোখে পড়ার মতো, আগে বাড়িতে কত লোক থাকত আর তার সাথে আরো কত লোক আসতো। আমার মনে আছে পুজোর সময় সেজ পিপি সবার আগেই চলে আসতো আর তারপর একে একে অনিমা পিসি, লালী পিসিরা আসতো। বাড়িটা কেমন যেন গমগম করত। শতবর্ষের ভিভিওটা মাঝে মধ্যেই দেখি — কতলোক বাড়ি লোকে লোকারণ্য। কিন্তু গত ১৫ বছরে যাকে পরিভাষায় বলে "ফুটফল" বা পদারণা তা যেন মারাত্মক ভাবে হ্রাস পেয়েছে। মনে পড়ে প্রায় ৩০ বছর আগে একবার টালায় আমার বাবার মামার বাড়ির পুজো দেখতে গেছিলাম ঘটনাচক্রে—দেখেছিলাম পুরো ঠাকুর দালান প্রায় খালি— সবই আছে শুধু পুজোর প্রাণটাই নেই—আজকের পুজোয় ঘটনার ঘনঘটা নেই, আছে গতানুগতিকতার আধিক্য যে কারণে সীমিত কুশিলব নিয়ে মারকাটারি পোলাও হয়ে যায় পানসে। এখনকার পুজোর কান্ডারী হলো দাদাভাই আর বুড়ো। তাদের অক্লেশ এবং নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের এক অনবদ্য নিদর্শন আমাদের পুজো। বাজার-হাট-দোকান-পাঠ, বাড়ির রং, ঠাকুরের বায়না, গুনে বা বলে শেষ করা যাবে না, আর পার্শ্বচরিত্রে আমরা ক্যামিও রোলে উঁকিঝুকি মারি। অবশ্য এটাও ঠিক আগে সেই ছোড়দাই সিংহ ভাগ সামলাত এবং বাকিরা দরকার মতো ঠেকা দিয়ে যেতো। ঠাকুর বিসর্জন একটি অম্লমধুর ঘটনা — একদিকে যেমন এবারের মত পুজো শেষ, অন্য দিকে গঙ্গায় গিয়ে ঠাকুর ভাসান দেওয়া—আনন্দ আর দুঃখ প্রায় সমান সমান বললেই চলে। যখন ছোট ছিলাম তখন খুব ভয়ে থাকতাম যে বাপি গঙ্গায় নিয়ে যাবে কিনা বা যেতে দেবে কিনা — লরি থেকে যদি

পড়ে যাই গঙ্গার ঘাটে যদি হারিয়ে যাই ইত্যাদি সব, ভয়ের কোনো শেষ ছিল না। তারপর যখন একটু বড় হলাম, তখন বাপি বুঝতে পারলো যে ঠাকুর ভাসানে আমি যাবই তাই আমাকে পাহারা দেবার জন্য অনেক কষ্ট করে হলেও যেত। আর আমাদের বাড়ির লরিতে বাড়ির মেয়ে, বউরাও মহা উৎসাহে যেত এবং এখনো যায় — তাই ছানাপোনাদের ভালো দেখাশোনা হয়। যাতে বেয়াদপি কেউ না করে, তাই লরির মাথায় উঠে বসতাম ঠিকই কিন্তু খুব একটা উদ্দীপনা দেখানো যেত না, মাঝেমধ্যে লরির মাপ ছোট হয়েছে আর তাতে প্রায় মুড়ির টিনের মতো আমরা যেতাম তবে ইদানিং কালে লরিতে জায়গা একটু বেঁচেই যায়। যখন আমার বিয়ে হয়ে গেল, তখন ভাসানে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছি আর মা দস্তুরমতো বাপিকে বলছে, "একি তুমি এখনো ঘুমোচ্ছ, ছেলে তো গঙ্গায় যাচ্ছে, তুমি যাবে না?" বাপি শুধু পাশ ফিরে উত্তর দিয়েছিল, "ওকে এখন পাহারা দেবার লোক আছে, আমার আর যাবার দরকার নেই" বুঝলাম এই যে আমার শাসনদণ্ডটা আমার অজ্ঞাতেই আমার বাবা-মা আমার স্ত্রীর কাছে দিয়ে দিয়েছে।

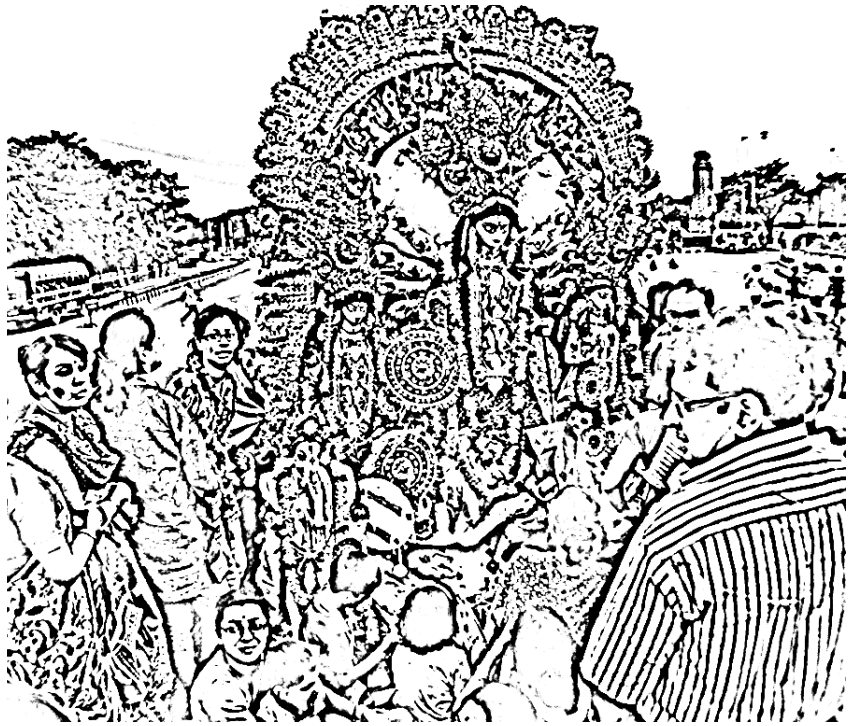

স্মৃতি থেকে
প্রবাল মুখোপাধ্যায়

আমার মামার বাড়ি ৮নং পটুয়াটোলা লেনে। প্রায় ১৫০ বছরের স্থপতিও বলা যায়। হেরিটেজ বিল্ডিং; কারণ পরাধিন ভারতের প্রথম ভারতীয় এটর্নী জেনারেল ছিলেন এই বংশেরই কৃতিমান পুরুষ শ্রী বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তিনি ছিলেন রাণী রাসমনির এটর্নী। সম্পর্কে তিনি হলেন আমার মায়ের দাদুর দাদু।

সেই শিশুকাল থেকেই আমরা তিনভাই রানা, শৈবাল ও প্রবাল আমরা মামার বাড়ির তিন সরিকের কাছেই খুব আত্মীক ভাবে প্রকৃত অর্থে সম্পর্কযুক্ত। তাই কাশফুল ফুটলেই প্রতি বছর দুর্গামা ডাকতেন আমাদের মামার বাড়ির কুমোরের কাঠামোয় মাটি লেপনের প্রথম দিন থেকেই। আমাদের বোন না থাকায় সেই জ্ঞান হওয়া থেকেই আমাদের দিদিমা শ্রীমতি কনকলতা দেবী প্রতি বছরই ভাইফোঁটা দিয়ে বোনের দুঃখ মোচন করতেন। মামার বাড়ির পারিবারিক আচার বিচার ও জীবনযাপনের অত্যন্ত সাদামাটা ধারা অথচ প্রত্যেকেই সংস্কৃতিক আভিজাত্যে উচ্চমানের যা এই বর্তমান প্রবাহমান তথাকথিত গ্লোবালাইজেসন এর স্রোতে বিলুপ্ত প্রায়। এর ফলেই বর্তমান প্রজন্ম আজ সম্পূর্ণ নিশ্বঃ অন্তত জীবনের মূল্যবোধ বিচারের ক্ষেত্রে।

বহুদিন পর যখন এ বারের মামার বাড়ির দূর্গাপূজায় স্ত্রোত্রপাঠের উদ্দেশ্যে সেই প্রকান্ড সিংহদুয়ার ঠেলে প্রথম পদক্ষেপ বাড়ির দেউড়ির সম্মুখে প্রবাদ প্রতিম পুরুষ সেই বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় এর তৈল চিত্রের মুখবয়বের উজ্জ্বল নয়নের মনির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম, ঠিক সেই মুহুর্তেই আমার ধমনীতে এক প্রচন্ড শিহরণ অনুভব করলাম। অর্থাৎ মনের মণিকোঠা থেকে এই স্পন্দন ঠিকরে বেরিয়ে এল যে—আরে এই মানুষটার জিন ও তো আমার মধ্যে আমার অবচেতনে কাজ করে চলেছে তাহলে আজকের এই বিজ্ঞান মনের সঙ্গে জিনের সম্পর্কের ব্যাখ্যা কে দেবে? তাহলে এই অনুভূতি কি সবার মধ্যেই হয়েছে? তাহলে মানুষের মনের মধ্যে বহু ধরনের প্রভাব মিশ্রিত হয়ে সত্ত্বা বিশেষে ফল দান করে? তবে এ ব্যাপারে খুব ভাল বৈজ্ঞানীক ব্যাখ্যা দিতে পারে আমার মামাতো দিদি শর্মীলা যিনি এই Jenome Project নিয়ে কাজ করেছেন।

এই বাড়ির তিন কর্তা ছিলেন তিন ধারার মানুষ। বড়ো তরফ শ্রী সৌরেন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন পশুপক্ষী প্রেমী তিনি ছিলেন ময়ূর ও পক্ষী বিশেষজ্ঞ। বহু ধরনের দেশবিদেশের দামী পাখী এ বাড়িতে পুষতেন এবং তা দেখতে বহুলোক আসতো এই ব্যানার্জী বাড়িতে। এইখানে (সাদা ময়ূর ৪টে ও রঙীন ৩ টে), এছাড়াও ম্যাকাও, কাকাতুয়া এবং বিভিন্ন প্রজাতীর পায়রাও ছিল। তাদের খাবার জোগান

দেবার জন্য বিভিন্ন ধরনের পোকা এবং ফল বিক্রেতারা আসত। আমারই এক দুঃসম্পর্কের মামা একবার শিকার করতে গিয়ে দুটো চিতা বাঘের ছানা বাড়িতে পুষেছিলেন কিন্তু একটু বড় হতেই তাদের পাঠানো হলো আলিপুর চিড়িয়াখানায় বাড়ির বয়জ্যেষ্ঠদের আদেশে।

এবার আসি মেজ সরিকের কথায়। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আমার দাদু তিনি অল্প বয়সে মারা যান তার পাঁচ অবিবাহিত মেয়ে ও তিন ছেলেকে রেখে। তখনকার দিনে কলকাতার অন্যতম উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পৃষ্টপোষক হিসাবে ওনার প্রভুত খ্যাতি ছিল। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, সচিনদাস মতিলাল, গিরিজা দেবী, জ্ঞান গোষাই ইত্যাদি বহু নামজাদা গায়ক ও বাজীয়েদের আনাগোনা ছিল এই বাড়িতে। বহু সঙ্গীত শিল্পিদের ভরনপোষন এর দ্বায়িত্ব নিতেন এই হীরুবাবু। তারা অনেকে পরবর্তীকালে বাংলা তথা ভারতবর্ষের নামজাদা সঙ্গীতশিল্পী রূপে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তৎকালীন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের খ্যাতনামা শিল্পী গহরজান এই বাড়িতে অনুষ্ঠান করে গেছেন। বহু ঘরানার শিল্পীদের আর্থিক সহায়তাও করতেন এই হীরুবাবু।

আমার নিজের বড়োমামা স্বর্গীয় বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি মাত্র দশ বছর বয়সে সারা বাংলা শিশু প্রতিভা প্রতিযোগীতায় সব বিষয়েই

ছবি ঃ বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। বিভাগগুলি ছিল ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও কির্তন। তিনি ছিলেন বাদল খাঁর প্রিয় ছাত্র। ওনার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়।

এ বিষয়ে তৎকালীন আনন্দবাজার পত্রিকাতে তার মেডেল পরিহিত ছবি ও তথ্যাবলী প্রচার করা হয়। এই বাড়িরই ছেলে ভারত বিখ্যাত হারমনিয়াম বাদক মন্টু বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার গুরু মুনশ্বর দয়াল।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য চলচিত্র জগতের বিখ্যাত ছবি হারমনিয়ামএ যে হারমনিয়ামটি দেখানো হয়েছে তা এই মন্টু দাদুরই ব্যবহৃত হারমনিয়াম। বাংলা চলচিত্রের ইতিহাসে ছায়াদেবী অভিনিত হারমনিয়াম ছবি জুড়ে যা যা হারমনিয়ামের গৎ বাজানো হয়েছে তা পুরোটাই মন্টু বন্দ্যোপাধ্যায় এর বাজানো অংশ বিশেষ। এনার সুযোগ্য পুত্র মহারাজ বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন কলকাতার নামজাদা সরোদ বাদক।

হিরুবাবুই এই মন্টু বন্দ্যোপাধ্যায় কে শৈশব থেকে সঙ্গীতশাস্ত্র হাতে খড়ি দেন ও যে

তানপুরাতে ঐ হাতেখড়ি হয় তা এখন আমার কাছে সযত্নে রাখা আছে যার বয়স আনুমানিক ১০০ বছর।

মন্টু বন্দ্যোপাধ্যায় আমার মামা শ্রীমতি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে শৈশবে যে ছোট স্কেল চেঞ্জ হারমনিয়াম উপহার দিয়েছিলেন তাও আমার কাছে সযত্নে রাখা আছে এক দুষ্পাপ্র বাদ্যযন্ত্র হিসাবে।

এ বাড়ি ছোট সরীক হল মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের এক কৃতিছাত্র ও ফুলের বাগান ও মাছধরাতেই অবসর সময় ব্যয় করতেন এবং ছিলেন খুব সাংস্কৃতিবান ব্যক্তি। অর্থাৎ তিন সরীক এর ধারা থেকে বোঝা যায় যে তাতে ছিল খুব উচ্চ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও মেধা যা একমাত্র বংশগতিই বহন করে তার মূল্য অর্থে বিচার্য্য কখনই হতে পারে না।

এই বংশের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে বল্লাল সেন কানপুর থেকে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনেন তার মধ্যে যোগেশ্বর অন্যতম। তার বংশধর সীতারাম সংসার ত্যাগ করে সন্যাস নিতে মনস্থ করলে কুলদেবী তাকে স্বপ্নাদেশে কালী মূর্ত্তি রূপে দেখা দেন, (আনুমানিক ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে) মাতৃকূলে তৎকালীন নবগ্রামে (নগাঁ) যে কালীমূর্ত্তি স্থাপন হয় তা খাল থেকে পাওয়া নিম কাঠের তৈরী এবং স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী যার রূপ কালী মূর্ত্তী রূপেই। এই কালী মূর্ত্তিটির নাম করন হয় "যোগেশ্বরী" নামে।

এই বংশে এক মহান যোগী ছিলেন সীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়। সীতারামের দুই পুত্র রামহরি ও রাম নিধি। রামহরি প্রথম কলকাতার পটুয়াটোলার এসে বসবাস শুধু করেন। তারপর তার ভাই রাম নিধি আসেন। এই রাম নিধির সুযোগ্য পুত্র হলেন তারাচাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কমপানির দেওয়ান ছিলেন। তারই সুযোগ্য পুত্র বেণীমাধব। নব গ্রাম দক্ষিন চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত। যেখান থেকে জীবিকার অন্বেষণে আসেন এই বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের রামহরি।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে এই বেণীমাধবের পুত্র বিনোদ বিহারী এই ৮নং পটুয়াটোলা লেনে নতুন এই প্রাসাদসম গৃহ নির্মাণ করেই এই দূর্গাপূজার প্রচলন করেন। প্রখ্যাত হারমনিয়াম বাদক মন্টু বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন তার পুত্র সতীরঞ্জন এর সন্তান।

বর্তমানে এই কর্মযোগ্য অত্যন্ত নিষ্টা ও আন্তরিকতার সঙ্গে বছরের পর বছর সুষ্ঠভাবে সম্পাদনা করে চলেছেন, যা এই বর্তমান ভোগবাদী ও স্বার্থপরতায় ভরা সমাজে উপযুক্ত নজীর হয়ে রয়েছে উপনগরীর মণিকোঠায়।

মোবাইল নেটে, ইউটিউবেও পাঠকগণ এই বাড়ির শতবর্ষপূর্তীর পূর্ণাঙ্গরূপ উপভোগ করতে পারবেন কলকাতার বনেদী বাড়ির পূজা ক্লিপিংশে। এই প্রসঙ্গে উপযুক্ত নথী ও প্রমাণ সমেত ইউটিউব ও জি বাংলা চ্যানেলের প্রাসঙ্গিক অনুষ্ঠান থেকেই প্রমাণ পাওয়া যাবে যে বর্তমান প্রজন্ম তাদের মেলবন্ধনকে অটুট রেখে পরবর্তী প্রজন্মকে উচ্চভাব ধারার রুচি ও ঐতিহ্যপূর্ণ বাঙালীয়ানার আদর্শকে বজায় রেখে সুনিপুন ভাবে বর্তমান নিউক্লিয়াস পরিবারের কাছে এ দৃষ্টান্ত তুলে ধরে রেখেছে যেটা অনুভব করা যায় ৮ নং পটুয়াটোলা লেনের ব্যানার্জী বাড়ির সিংহ দুয়ার ঠেলেই দেউড়ির উপরে

সযত্নে রাখা ভারতের প্রথম এটর্নী জেনারেল বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় এর তৈলচিত্রের প্রশান্তি ও সন্তুষ্টিতে ভরা নয়নের মনির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই।

এই লেখনীর শেষে ঈশ্বরের কাছে আমার একটিই নিবেদন যে ঈশ্বর যেন তার সৃষ্টির অপূর্ব কর্মধারা অনুযায়ী এই বংশে সেই সব মহান সত্ত্বাদের পাঠিয়ে যান, যেন তারা মহান সংস্কার ও প্রতিভা নিয়ে এই বংশে জন্ম প্রাপ্তিতে দেশের ও দশের কল্যানে, অব্যাহত থাকতে পারে এবং এটাই এই বংশের ধারার সার্থকতা।

সম্প্রতি এই বছর অর্থাৎ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ এর দূর্গোৎসবে নবমীর দিন এই পূজা পরিবারের আয়োজনে সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তি অনুষ্ঠিত হল। এই তিন শাখায় শিশুরাও অভূতপূর্ব প্রতিভার প্রমান দিল। এই অনুষ্টানের সমাপ্তিতে আমি ঈশ্বর বন্দনা (ইষ বন্দনা - শিল্পী ঃ অনুপ জলোটা কৃত স্তোস্ত্র) রাগের উপর পাঠ করে নিজেকে ধন্য মনে করে অত্যন্ত তৃপ্ত হয়েছি।

তবুও জীবন

প্রবাল মুখোপাধ্যায়

দূর্গা দূর্গা বল ওরে মন
সব দূর্গতি যাবে দূরে
দূর্গাচরণ করবে শরণ
ভরবে জীবন আনন্দসুরে।।

দূর্গাতিনাশিনী মা আমার
বহেন ত্রিভূনেরই ভার
ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বর
সব দেবতা তাঁর স্তুতি করে।।

জগদ্ধাত্রী রূপেতে মা
জগৎ ধারণ করেন রমা,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলা
করেন যুগে যুগান্তরে।।

অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা
করেন ধরা শস্য পূর্ণা
লক্ষ কোটি সৃষ্ট জীবে
রহিবে এ ব্রহ্মান্ড জুড়ে।

The Legend lives on....

Meenakshi Banerjee

A big house with a bigger heritage
Stands on 8 Patuatola Lane...
The house is old but do you know
That it is made up of pillars of gold?

The pillars of gold stand erect and strong
Assuring one and all that nothing can go wrong.
Happiness prevails and love binds all
The feelings are true and the values stand tall.

The great lives who have been here
Have paved the way,
So that all those who follow after them
Can enrich their heart and soul day after day.

A rich tradition and glory
Is for everyone to bask,
The grand Durga puja of years and the upkeep of its grandeur
Is but a great task.

The durga Puja which is celebrated
With great devotion, pomp and show;
Brings great, joy, unending jubiliation
And the feelings of love and oneness flow.

On the auspicions occasion of 125 years
of the arrival of the Goddess in this sacred thakur dalan
We are all overwhelmed to be a part of
This great Master Plan...

আমার বাপের বাড়ীর পুজো

সোমজিতা মুখোপাধ্যায়

আমার বাপের বাড়ীর দুর্গা পুজোর বয়স ১৩২ বছর। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দেখেছি যে প্রত্যেক বছর আমাদের বাড়ীতে পুজো হয়, সেটা যে অসাধারণ কিছু তা কোনদিনই মনে হয়নি। কিন্তু আজ যখন সেই দুর্গাপুজো সম্বন্ধে লিখতে বসেছি তখনই যেন প্রথমবার মনে হল যে আমরা সত্যিই খুব ভাগ্যবান তাই ছোট থেকে বাড়ীর পুজোর আনন্দের মেতে উঠতে পেরেছি।

ছোট বেলার পুজোর প্রথম প্রস্তুতি হিসেবে মনে আছে বাপীর সাথে সব জ্যাঠতুতো, খুড়তুতো ভাইবোন মিলে কুমোরটুলি যাওয়া—কখনও ঠাকুরের বায়না দিতে কখনও বা ঠাকুর কতটা গড়া হয়েছে তা দেখতে। আমার ছোট বেলায় কয়েক বছর বাড়িতে ঠাকুর দালানে ঠাকুর সাজানো হয়েছিল। কুমোর আসতো রাত করে আর আমরা ভাইবোনেরা হাঁ করে ঠাকুরের চক্ষুদান, শাড়ি গয়না পরানো, চুল লাগানো এবং বার্নিস করা দেখতাম। অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে বলে মা, জ্যাঠাইমারা ডাকাডাকি করলেও কেউ ওপরে শুতে যেতাম না। কারণ, কুমোরের কাছ থেকে রাংতা, শাড়ির টুকরো, পুঁতি ইত্যাদি কতনা মূল্যমান সম্পত্তি যোগাড় করতে হবে যে। পুজো মানে আমাদের ছোটদের কাছে ছিল আনন্দ, আড্ডা। তবে মা বাবাদের পরিশ্রমের সীমা থাকত না পুজোকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে, সব নিয়ম মেনে পরিপূর্ণতা দান করতে।

তারপর যখন আরও বড় হলাম তখন পুজো মানে হল সাজগোজ, ঠাকুর দেখা, বাড়ীতে পুজোর সময় সব ভাইবোন বন্ধুবান্ধব মিলে আড্ডা দেওয়া। পুজোর সময় তখন আমার আর বুড়িদির কাজ ছিল সন্ধিপুজোর চাল বাছা; বেলপাতার মালা গাঁথা, সন্ধিপুজোর প্রদীপের সলতে পাকানো। মহালয়ার পর বোধন বসলে কোনো কোনো দিন চন্দন ঘষা। আমি যেহেতু কন্‌ভেন্ট স্কুলে পড়তাম তাই পঞ্চমীর আগে পর্যন্ত রোজ স্কুলে যেতে হত মন খারাপ করে।

এভাবেই এসেছিল শতবর্ষের পুজো। তখন আমি সবে স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হয়েছি। সেই বছর আমাদের বাড়ীতে পুজোর সময় এসেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীঅজিত কুমার পাঁজা। আমি স্কটিশে পড়ি শুনে ডেকে অনেক গল্প করেছিলেন কারণ তিনিও ওই কলেজেরই ছাত্র ছিলেন। সেই সময় পরপর কয়েক বছর শ্রী রামকুমার চট্টোপাধ্যায় আমাদের বাড়ীতে গান গেয়েছিলেন। তিনি আসছেন শুনে আমি, টিঙ্কু আর মৌসুমী ঔৎসাহের সঙ্গে বসে থাকতাম যে তাঁর সাথে সেই হ্যান্ডসাম ছেলেটি আসবে কিনা।

এখন আমার বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ের পর প্রতি বছর আমার সাথে আমার বর বিশ্বজিতও আমাদের বাড়ীর পুজোয় যোগদান করে আমারই মত উৎসাহে। আমার মেয়ে রাজসীরও একান্ত প্রিয় তার মামার বাড়ির পুজো—বিশেষ করে দশমীর বেড়া-অঞ্জলী, সিঁদুর খেলা দেখা ও ঠাকুর ভাসান যাওয়া।

নব আনন্দে জাগো...

মোহিনী বন্দ্যোপাধ্যায়

আজি।
নতুন আকাশ নতুন বাতাস
রঙীন স্মৃতি
পুষ্প পল্লবে ভরা ধরা
সুগন্ধময় মাটি।

পুজোর ঢাক কানে বাজে
পুজোয় উৎসারিত হয় প্রাণ
ঢাকের তালে হৃদয় নাচে
চিত্তে জাগে মায়ের গান।

সঙ্গীত মুখর ছড়িয়ে হাওয়ায় হাওয়ায়
উল্লাসিত আত্মহারা হয় জীবন
শরতের মধুর মৃদু ইসারায়
মেতে ওঠে মন।।

মনোহরা মায়ের মূর্ত্তি
সুমিষ্ট নেত্রের চাওনি
কি দারুণ চিত্রপট আঁকা
ওই রাঙা চাদোয়ার ছাওনি।

বিশাল দালানের মাঝখানে
বিরাজমান 'মা'
সর্ব শোক হরনে
তুমি হও ত্রাতা।।

এসেছে মা পিতার গৃহে
প্রফুল্ল প্রাণে
আনন্দে আমরা শিউলি গেঁথে
দেব তোমার শ্রীচরণে।।

কাটালেই বা কত দিন এই আলয়
যে নিচ্ছো এবার বিদায়?
ফিরে যাচ্ছো সেই তুষার হিমালয়
শূন্য করে মোর হৃদয়।।

মামার বাড়ির দুর্গাপুজো

রাজসী মুখোপাধ্যায়

মামার বাড়ির দুর্গা পুজো মানে আমাদের ভাষায় হল্লা, গুল্লা, আড্ডা, মস্তি। প্রথম দিকে যখন যেতাম তখন আমি খুব ছোটো। এক গাদা দাদা, দিদি আর অনেক .... অনেক বাধা নিষেধ—'ওদিকে যেও না', 'সিঁড়ি দিয়ে একা নেমো না'; আরো কত কি। আর এখন ICSE-র পরে আমি বড়দের দলে — কচি গুলোকে সামলানো এখন আমার কাজ।

কনভেন্ট স্কুলে পড়তাম বলে ঠাকুর আসা আমার প্রায় কখনোই দেখা হত না, ওই দু-একবারই যা দেখেছি। তখন প্রতিবার বড়রা বলত 'মা আসবেন গজে কিংবা নৌকায় কিংবা ঘোড়ায়।' কিন্তু প্রতিবারই পটুয়াটোলা গিয়ে দেখতে পেতাম ঠাকুর আসছে লরি চড়ে। এই নিয়ে মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ছিল অনেকদিন।

বরাবরই দারুণ লাগত মামার বাড়ির পুজো অঞ্জলি আর সন্ধি পুজো তাই প্রায়ই থেকে যেতাম রাত্রে। অনেকের সঙ্গে গুঁতোগুঁতি করে শোয়ার মজা এই পুজোর দিনগুলোতেই শেখা।

সপ্তমীর দিন দুপুরে মামার বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া হত। সবই নিরামিষ— আর আমার নিরামিষ ভালো লাগে না। কোনো মতে নাক টাক কুঁচকে খেয়ে নিতাম। কিন্তু এটা পুষিয়ে যেত দশমীর রাত্রে বিসর্জনের পরে লুচি আর পাঁঠার কালিয়ার মাধ্যমে। যে বার মাংস হত না সেই বার থাকত বড় বড় হাঁসের ডিমের ডালনা—বাবাইয়ের পোয়া বারো।

বিসর্জনে যাওয়া আর এক দারুন মজা। সিঁদুর খেলার শেষে ঠাকুর ঘোরানো আর তার পরে অনেকে মিলে হেঁইও-হেঁইও করে ঠাকুরকে লরিতে তোলা হত। আর আমরা, ছোটোরা, সেই ফাঁকে সরিয়ে ফেলতাম ঠাকুরে অস্ত্রশস্ত্র, গণেশের ইঁদুর আরো কত কি (একটা ইঁদুর এখনো আছে আমাদের বাড়িতে।) তার পরে বাড়ি সুদ্ধু সবাই লরিতে উঠে বাবু ঘাটে যাওয়া—চিকুমামা লরির মাথায় উঠে ঠাকুর ধরে থাকত আর লগা দিয়ে তুলে দিত ঝুলে থাকা ইলেকট্রিকের তার। দাদু আর হরি দাদু, থাকত লরির কেবিনে। বিসর্জনের পরে সবাই মিলে বেলুন ওড়াতে-ওড়াতে আর ভেঁপু বাজাতে-বাজাতে ফিরতাম পটুয়াটোলায়। তার পরে শান্তির জল, খাওয়া-দাওয়া এবং বাড়ি ফেরা। কিন্তু একবার আমাদের রাতে বাড়ি ফেরা হয় নি। সে বার সবাই সিদ্ধি খেয়েছিল, আর তারপর... যাক গে সে কথা — সেধে গাঁট্টা খেতে আর কে চায় বলো!

মনের কথা

সোহিনী বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি এই ৮নং পটুয়াটলা লেন বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির কন্যা। বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির কন্যা হওয়ার কারণে আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি আমার বাড়ির দুর্গাপুজো, সেটা আমার অহংকারও বটে। কলকাতা শহর যেমন শারদ উৎসবের প্রাণ কেন্দ্র, আমাদের এই দুর্গাপুজো আমাদের বাড়ির প্রাণ ভ্রমর।

আমার ছোট থেকে যখন বোধজ্ঞান হয়, তখন থেকে আমি এই দুর্গাপুজো দেখেই বড় হয়েছি। আমার বন্ধুদের মতো আমার দুর্গাপুজো কখনই প্যান্ডেলে ঘুরে ঠাকুর দেখে কাটে না, কিন্তু ভাবতে কখনোই কষ্ট হয় না যে আমি কলকাতা শহরের এত ঠাকুর কেন দেখিনা বা দেখতে যাই না। সবার কাছে পুজো চারদিনের হলেও আমার কাছে পুজো হয় দশদিনের। মহালয়ার সকালে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র মহাশয়ের পাঠ শুনে শুরু হয় আমাদের পুজো, এই মহালয়া শোনার ব্যাপারে সবসময় পাশে পেয়েছি আমার জ্যেঠু ও আমার ভালো পিসিকে। ভোর ৪টে থেকে তাল মিলিয়ে চলে আমাদের মহালয়া শোনা।

মহালয়ার পরদিন প্রতিপদ থেকে আমাদের পুজোর ঘট বসে, শুরু হয় মায়ের আগমনের আয়োজন। আমি ছোট থেকেই দেখেছি আমার মা জ্যেঠিমা, ঠাম্মীরা পুজোর ভোগের কাজে নামে সকাল থেকে, খুব সুন্দর করে নিজেরাই, নিজেদের দায়িত্ব ভাগ করে নেয়, সেই নিয়ে কোনোদিন কারোর ক্লান্তি বা অনীহা দেখা যায় না। যেন এই সময়টার জন্য থাকে সারা বছরের অপেক্ষা, আমাদের বাড়িতে "মা" -এর আয়োজন করে আমাদের বাড়ির সদ্যসরা, খুব নিষ্ঠাসহকারে সেই কাজে সবাই মেতে ওঠে। প্রতিপদ থেকে ষষ্ঠী পর্যন্ত্য আমাদের যে পুজো হয় তাকে আমরা বলি ছোট পুজো, যা হয় আমাদের বোধন ঘরে। চতুর্থীর দিন আমরা বাড়ির ছোটরা ও বড়রা সবাই মিলে যাই প্রতিমা আনতে, সে এক অনাবিল আনন্দ। ***"সেই আনন্দের ভাগ হবে না।"*** ষষ্ঠী থেকে হয় মায়ের বোধন যা শুরু হয় ঠাকুর দালানে, তাই ঠাকুর দালান ঘিরেই চলে আমাদের চারদিনের পুজো পরিক্রমা। শুধু পুজো নয় আমাদের বাড়িতে পুজোর সময় চলে আমাদের বাড়িতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, একসময় বাইরে থেকে অনেক অতিথিরা আসতেন নানা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে, এখন আমরা বাড়ির সদস্যরাই নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করি। তারপর থাকে ধুনুচি নাচ, যাতে বেশির ভাগ আমরা বাড়ির মেয়েরাই অংশগ্রহণ করি। আমি একটা বিষয় দেখেছি যে আমাদের বাড়ির মেয়েরা, মা দুর্গার মতোই দশভুজা। পুজোর সাথে চলে খাওয়া-দাওয়া, আনন্দ, আড্ডা বন্ধুদের আগমন। আমায় আমার বাড়ির পুজো এক অমলিন আনন্দ দেয় যা হয়তো ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার ও তার দুর্গাপূজোর ইতিহাস

গ্রন্থনা ঃ মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়

পণ্ডিতরা হিন্দুধর্মকে বিভিন্ন উৎস থেকে উদ্ভুত ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ হিসাবে মনে করেন, যার কোনো একক প্রতিষ্ঠাতা নেই।

এই ধর্মের উৎপত্তিস্থান এশিয়া মাইনর অর্থাৎ আজকের তুরস্ক, ইরান, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, জর্জিয়া, রাশিয়ার অংশ বিশেষ, কাজকিস্তান অঞ্চলের কোন এক স্থানে আর্য জাতির মাধ্যমে খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ থেকে ৩০০০ সালের মধ্যে হয়েছে বলে মনে করা হয়।

এই ধর্মের ইতিহাসকে কয়েকটি ক্রমবিকাশের যুগে ভাগ করা হয়। প্রথম পর্যায়টি প্রাক-বৈদিক যুগ হিসাবে গণ্য করা হয়, যার শেষ আনুমানিক ১৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে। এই সময়ের মধ্যে সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা এবং স্থানীয় প্রাক-ঐতিহাসিক ধর্মগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বলে মনে করা হয়।

১৯০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে ১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে কোনো এক সময় ইন্দো-আর্য অভিবাসনের সাথে ঐতিহাসিক ***"বৈদিক ধর্মের"*** প্রবর্তন শুরু হয় এবং উত্তর ভারতে বৈদিক যুগের সূচনা হয়।

এই হিন্দু সংমিশ্রণ বৈদিক যুগের পরে ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ ও ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে দ্বিতীয় নগরায়নের সময়কালে হিন্দুধর্মের ধ্রুপদীযুগের শুরুর দিকে আবির্ভূত হয়, যখন ***"মহাকাব্য"*** ও প্রথম ***"পুরান"*** রচিত হয়।

উক্ত সময়কালে যে সমস্ত ব্যক্তিরা আধ্যাত্মিক এবং ভৌতিক তত্বে জ্ঞানী, পরম বুদ্ধিমান, দূরদর্শী, সচ্চরিত্র এবং ত্যাগ স্বীকার করে ঐ সব বিষয় নিয়ে চর্চা করতেন তাঁদের ***"মুনি"*** বলা হয়।

এঁদের মধ্যে যে সমস্ত মুনি তপস্যাবলে বেদের মন্ত্র প্রকাশ করতে পারতেন, তাঁদের বলা হত ***"ঋষি"***। অর্থাৎ মুনিদের থেকে 'ঋষিরা' ছিলেন উচ্চস্তরের। যেমন ঃ- গার্গী, কন্ব, কশ্যপ, বশিষ্ট, বিশ্বামিত্র, গৌতম, লোপামুদ্রা প্রভৃতি। বৈদিক মন্ত্র যাঁরা অনুধাবন করতেন ও তাহা অন্যের নিকট প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করতেন তাঁরা "ঋষি" হিসাবে খ্যাত।

ঋষিদের সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা ঃ ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি, দেবর্ষি, কান্ডর্ষি, রাজর্ষি, পরমর্ষি ও শ্রুতর্ষি।

ব্রহ্মর্ষি ঃ— ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্পর্কে যেসব ঋষিদের বিশেষ জ্ঞান ছিল তাঁরা। যেমন ঃ বশিষ্ট।

মহর্ষি ঃ— ঋষিদের মধ্যে যারা মহান ও প্রধান ছিলেন তাঁরা মহর্ষি = মহা+ঋষি। যেমন ঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন 'বেদব্যাস (ইনি বেদকে চারভাগে বিভক্ত এবং মহাভারত রচনা করেছিলেন)।

দেবর্ষি ঃ—দেবতা হয়েও যারা ঋষিত্ব অর্জন করেছিলেন, তাদের বলা হতো দেবর্ষি = দেবতা + ঋষি। যেমন ঃ নারদ।

হিন্দুধর্ম অনুসারে ঃ — সৃষ্টির দেবতা ***"ব্রহ্মা"*** জ্ঞান ও বেদের প্রতীক ঃ মহাবিশ্বের স্রষ্টা, ত্রিমূর্তি গোষ্টির সদস্য ঃ অপর দুইজন হলেন ***"বিষ্ণু"*** ও ***"শিব"***।

ব্রহ্মা ঃ— সৃষ্টি, জ্ঞান ও বেদ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাঁর অন্যান্য নাম স্বয়ম্ভু, বিরিঞ্চি, প্রজাপতি (প্রজার পতি অর্থাৎ পালক), তাঁর বাহন হংস। তাঁর সঙ্গী সরস্বতী (ব্রাহ্মণী)। তাঁর ১৮ জন মানস পুত্র ছিলেন। যথা ঃ অঙ্গীরা, অত্রি, ভৃগু, চিত্রগুপ্ত, দক্ষ, কাম, মরীচি, নারদ, পুলহ, পুলস্ত, বশিষ্ঠ ইত্যাদি।

ব্রহ্মার অন্যতম মানসপুত্র ***'মরীচি'*** ছিলেন সপ্তর্ষির মধ্যে একজন। তিনি বেদান্তের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর পুত্র ***"মহামুনি কাস্যপ"***।

মহামুনি কাস্যপ কে মহাভারতে একজন প্রজাপতি (প্রধান প্রতিপালক) হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

কাস্যপ প্রাচীন আয়ুর্বেদ চর্চাকারী এক ঋষি, 'কাস্যপ সংহিতা' বা "জীবকীয় তন্ত্র" নামক প্রাচীন আয়ুর্বেদ গ্রন্থটি তাঁর অর্জিত চিকিৎসা-জ্ঞানের সংকলন যেখানে আয়ুর্বেদীয় শিশুস্বাস্থ্য, প্রসূতি স্বাস্থ্য ও আবেশবিজ্ঞান নিয়ে পর্যবেক্ষণ, প্রয়োগ ও সিদ্ধান্তসমূহ অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

কাস্যপ মুনির সুর ও অসুর আশ্রমটি মেরু পর্বতের (শ্রীনগর থেকে তিন মাইল) শীর্ষে অবস্থিত। কাশ্মীর নামটি তাঁর নাম থেকেই এসেছে। লোক কাহিনি অনুসারে এই প্রাচীন উপত্যকায় সতীসার বা পার্বতীসার নামে বিশাল এক হ্রদ ছিল। সেই জলাশয়ে এক দৈত্যের আবির্ভাব ঘটে। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য কাশ্যপ মুনি দীর্ঘ তপস্যা করে হিমালয়ের কোলে গড়ে ওঠা ওই মনোরম উপত্যকাকে রক্ষা করেন। তাঁর হাতে নবজীবন লাভ করেছিল বলে ওই জায়গার নাম হয় "কাশ্মীর"।

প্রজাপতি "দক্ষ" তাঁর ত্রয়োদশ (১৩ জন) কন্যাকে ক্যাপ হস্তে সম্প্রদান করেন। তাদের মধ্যে অন্যতমা 'অদিতি ও দিতি'। ঋষি কাস্যপ ও অদিতির তেত্রিশ পুত্র, এদের মধ্যে বারোজনকে (দ্বাদশ আদিত্য) এগারোজনকে (রুদ্র) এবং আটজনকে বসু (অষ্টবসু) বলা হয় এবং অন্যান্যদের রাজা বলা হয়। পুরানে অদিতিকে সকল দেবতার মাতা বা "দেবমাতা" বলা হয়। তার পুত্রদের মধ্যে অন্যতম হলেন দেবরাজ 'ইন্দ্র' ও ভগবান বিষ্ণুরূপী 'বামন অবতার'।

প্রজাপতি দক্ষের অপর কন্যা দিতির থেকে রাক্ষসরা জন্ম নেয়। এভাবে কাশ্যপের বংশ থেকে দৈব, দৈত্য, মানুষ, সাপ, পাখির সৃষ্টি হয়েছে।

কাস্যপ গোত্র খুব বিখ্যাত। সকল জীবই কাস্যপের বংশধর। কোনও মানুষ নিজের গোত্র সম্পর্কে অবগত না থাকলে পুরহিতরা তাকে কাস্যপ গোত্রের বলে অবিহিত করে শাস্ত্রাদি ক্রীয়াকর্ম করে থাকেন।

দেবল ঃ হিন্দু ধর্মে 'দেবল' একজন অন্যতম ঋষি ছিলেন। তিনি নারদ ও ব্যাসের মতো এক মহান ঋষি হিসাবে ভগবদগীতাতে অর্জুনের দ্বারা উল্লেখিত হয়েছেন। তিনি "কাস্যপ মুনির" পুত্র ও দেবাঙ্গ সম্প্রদায়ের পূর্বসূরি। তিনি "অগ্নি মনু" নামে পরিচিত ব্যক্তি।

দেবাঙ্গ এর অর্থ "ঈশ্বর"। যাদের বিশ্লেষণাত্মক, বোধগম্য, জ্ঞানসম্মত, অনুসন্ধানী, প্রমান নির্ভর এবং ব্যবহারিক প্রয়োগে নির্ভীক ও স্বতন্ত্র গবেষনা চারপাশের পার্থিব সব কিছুতে সত্য খোঁজার জন্য আকাঙ্ক্ষা এবং তাগিদ প্রতিফলিত হয় ও দার্শনিক গুণাবলী রয়েছে তারাই দেবাঙ্গ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। "দেবল" কাপড় বোনার পদ্ধতি তৈরী করেন। এর ফলে পোশাকের প্রতি মানবকুল আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং পোশাকের চাহিদা বেড়ে যায়। তাই ঋষি দেবলকে প্রথম তাঁতি বলা হয়।

ব্রহ্ম দেব

শান্ডিল্য ঃ এটি ব্রাহ্মণ গোত্র। এই গোত্রটি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের আটটি সর্বোচ্চ গোত্রের একটি। শান্ডিল্য গোত্র হল মৈথিলি ব্রাহ্মণদের মধ্যে সবচেয়ে বড় গোত্র। মৈথিলি ব্রাহ্মণদের মধ্যে শান্ডিল্য গোত্রের ৪৪টি মূল রয়েছে। শান্ডিল্য শব্দটি সংস্কৃত শব্দ, যার অর্থ 'পূর্ণ চন্দ্র' (সান = পূর্ণ + দিলম = চন্দ্র) বা "পূর্ণিমা"। তাই এনাকে 'চন্দ্র দেবতার' পুরহিত বা ঋষি বলা হয়। শান্ডিল্য গোত্রের 'বেদ' হল "সামবেদ"। মহর্ষি শান্ডিল্য ছিলেন মহর্ষি কাশ্যপের পৌত্র ও ঋষি দেবলের পুত্র। তিনি ছিলেন "বৎস ঋষির" শিষ্য। এছাড়াও তিনি 'বেদ' অধ্যায়ন করেন মহান ঋষি 'কৌশিক', গৌতম, মহর্ষি কুর্শি। এছাড়াও কৌন্ডিণ্য, অগ্নিবেস এবং ভরদ্বাজ ঋষির নিকট বেদ অধ্যয়ণ করেন। তিনি একজন অন্যতম প্রধান ছিলেন "আদিভৌতিক দর্শনে" পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি সূর্য বংশীয় 'অতিধ্বনবান সৌনক'-এর শিষ্য হিসাবে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনিই রচনা করেন সুপ্রসিদ্ধ "শান্ডিল্য উপনিষদ"। তিনি নেপালে "শান্ডিল্যগোত্রের পূর্বপুরুষ"হিসাবে পরিচিত। শান্ডিল্য ঋষির বংশধরেরা পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব, গুজরাট সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে বসবাস করতে শুরু করেছেন।

কাশ্যপ মুনি

দেবল ঋষি

ঋষি শান্ডিল্য

ঋষি শান্ডিল্য

(এনার বংশধরেরা নিম্নে বর্ণিত হইল)

↓

কলিব্যাস (কবিল্যাস)

↓

বামদেব

↓

মহাদেব

↓

ক্ষিতিশ

(ইনি ভিল্লি চত্বর বা জম্বু চত্বর, যা বর্তমানে 'জম্মু" নামে খ্যাত। (এটি তাওয়ি নদীর তীরে অবস্থিত। শহরটি উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা ও দক্ষিণে সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমির উত্তরাংশ দ্বারা বেষ্ঠিত। এটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০০০-১৩০০ ফুট উচ্চতায়।) ইনি পরবর্তীতে "কান্যকুব্জে" (কনৌজে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। যা ইতিহাস প্রসিদ্ধ দানবীর রাজা 'হর্ষবর্ধনের' রাজধানী হিসাবে প্রসিদ্ধ।)

↓

ভট্টনারায়ন

(ভট্ট নারায়ন)

(ইনি পরবর্তীতে পূর্ব ভারতের 'মানভূম' জেলার "পঞ্চকোটী" নামক স্থানে বসবাস করেন। স্বাধীনতার পরে জেলাটি বিহার রাজ্যর অর্ন্তগত হয় ও বর্তমানে "ঝাড়খন্ড" রাজ্যের অধীনে) মহাভারতের "সভাপর্বে" প্রকাশ্য রাজ সভায় কুরু পুত্রদ্বয় দুর্যোধন ও দুঃশাসন কতৃক কুলবধূ দ্রৌপদীর লাঞ্চনা ও পরবর্তীতে ভীম কত্তৃক দুঃশাসনের 'বেণী কর্তনের' মধ্যে দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের ঘটনা অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় 'বেণী সংহার' নাটকটি রচনা করেন। ১৩০৮ বঙ্গাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এটি বাংলায় অনুবাদ করেন ও এটি পুস্তক আকারে প্রকাশ করেন)

↓

ঋষি কলিব্যাস

বরাহ

↓

বৈনতেয়

↓

সুবুদ্ধি

↓

বিবুধেশ (বিবুধেয়)

↓

সুর্ভিক্ষ

↓

ভয়াবহ (ভয়াপহ)

↓

ধবল

↓

মহাদেব

↓

মকরন্দ

(***প্রথম কুলীন ঃ*** কুলীন অর্থ হলো উত্তম পরিবার বা সম্ভ্রান্ত বংশজাত। সন্মানলাভার্থে প্রজারা সৎপথে চলবে, এই উদ্দেশ্যে বাংলার সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথা সৃষ্টি করেছিলেন) এর থেকে বোঝা, ইনি ঐ সময়ের পূর্বে 'মানভূম থেকে এসে বাংলায় বসবাস শুরু করেছিলেন।

↓

বিনায়ক

(কোন্নগরের দক্ষিণে নবগ্রাম বা নপাড়ায় বসবাস শুরু করেন)

↓

ঈশান

↓

লক্ষণ

↓

হরি

↓

বশিষ্ঠ

↓

সর্বানন্দ

(***ইনি সর্বানন্দ মেলের আদি পুরুষ ঃ*** মেল শব্দের অর্থ 'জনপদ" বা "লোকারণ্য" অর্থাৎ যেখানের সকল বাসিন্দা একই বংশদ্ভুত।)

↓

বলভদ্র

↓

গুণানন্দ

(ছোট ঠাকুর) হুগলী জেলার জগাণ্ডায় বসবাস শুরু করেন।

↓

দুর্গাদাস

(ইনি বর্তমান দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার লক্ষীকান্তপুর সন্নিকটস্থ রামনগর থানার অধীনে নবগ্রাম বা নগাঁয় বাস করতে শুরু করেন)

↓

বলরাম

↓

সীতারাম

(ইঁহার স্ত্রীর অকাল বিয়োগের কারণে সংসার ত্যাগ করিয়া যাত্রা কালে পথি মধ্যে রাত্রি যাপনকালে স্বপ্নে, ***"কুঁচি দেওয়া শাড়ী পরিহিতা 'দুই হাত' বিশিষ্ট শান্ত কালীমূতির দর্শন পান"***। পরের দিন প্রাতে পথিমধ্যে স্বপনাদৃষ্ট অনুরূপ 'নিম কাঠের' মূর্তি প্রাপ্ত হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, সেটি প্রতিষ্ঠা করেন ও পুনরায় 'দার পরিগ্রহ' করিয়া সংসারী হন। পরবর্তী সময় তাঁর বাসস্থানের সন্নিকটে "তিন কুটরী বিশিষ্ট এক দালান নির্মাণ করে "দেবী মূর্ত্তি" সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হয় ও সেটি "নগাঁর কালী" হিসাবে অঞ্চলে পরিচিতি লাভ করে।)

↓

↓ ↓ ↓

রামহরি (১৭৯১-১৮৯১ সন)

(১৭৮৫ সালে বর্তমান কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে অবস্থিত, কলেজ স্কোয়ারের নিকটস্থ পটুয়াটোলা লেনে বসবাস শুরু করেন। ১৭৯১ সালে তিনি তাঁর মধ্যম ভ্রাতা 'রামনিধিকে' সাথে নিয়ে ৫৪ নং পটুয়াটোলা লেনে, দশদিনব্যাপী ***'দুর্গাপূজা'*** শুরু করেন খড়ের চালা বিশিষ্ট মৃত্তিকা নির্মিত দালানে।)

রামনিধি

↓

তারাচাঁদ (১৮১২-১৮৪৫ সাল)

(১৮১২ সালে কলকাতায় ভাগ্যান্বেষণে এসে তৎকালীন "ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর" অধীন এক ব্রিটিশের নিকট 'দেওয়ান' (অর্থসচিব এবং খাজনা আদায়কারী) হিসাবে নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে পটুয়াটোলা (পটুয়ারা বাস করতেন, তাঁদের পেশাকে সন্মান জানিয়ে, অঞ্চলটির নামকরণ হয়)

রামসুন্দর

(ইনি 'নবগ্রাম বা নগাঁয়' স্থিত "দেবী কালিকা" এর অর্চনা ও ঐ স্থানের 'ভূ-সম্পত্তি সহ দেবালয়ের' দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত থাকেন। প্রায় 'বিংশ শতাব্দী-র দ্বিতীয় দশক' পর্যন্ত শারদীয়া পূজার দশটি দিন নগাঁর বংশের আরাধ্যা দেবী 'কালিকার' পূজা শুরু হওয়ার সময় নির্দিষ্ট করে তার পরেই কলকাতায় 'দেবী দুর্গার' অর্চনা শুরু করার প্রথার প্রচলন বহাল ছিল।)

অঞ্চলে বেশ কিছু 'ভূ-সম্পত্তি' ক্রয় করেন। তিনি ও তাঁর উত্তর সূরীরা আরও কিছু সম্পত্তি বিভিন্ন স্থানে ক্রয় করেন, সেগুলির প্রথমাংশ বর্তমান 'কলকাতা পৌর সংস্থা' মোতাবেক ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ৯/১, ৯/১/২এ, ৯/১/১এ, ৯/১/১বি, ৯/২, ৯/৩, ৯/৪, ৯/৫, ৯/৬, ১১এ, ১১বি, ৫৪এ, ৫৪বি, ৫৪সি, ৫৪/১বি, ৫৪/১এ, ৫৫এ, ৫৫বি, ৫৮, ৫৮এ, ৫৮এ/১, ৫৮বি। পটুয়াটোলা লেন, থানা ঃ আমহ্রাস্ট স্ট্রীট, পোস্ট অফিস ঃ রাজা রামমোহন সরণী, পিন কোড নং ঃ ৭০০০০৯ এর অন্তর্ভূক্ত। উপরিউক্ত জমিগুলির ***"৯/২"*** চিহ্নিত জমিতে একটি 'তিন কোঠা বিশিষ্ট' পাকা দালান, তৈরী করিয়ে সেখানে 'পুজা' স্থানান্তরিত করেন।

তারাচাঁদের চারপুত্র ও সাত কন্যা

↓

বেণীমাধব	উমেশচন্দ্র	যোগেন্দ্রনাথ	কৃষ্ণচন্দ্র
(প্রথম ভারতীয় এটর্নি)	(এটর্নি)	(এটর্নি)	
(১৮৪৬-১৮৮৯ সাল)	↓	↓	
+	বিপিন বিহারী	গোবিনলাল	
শ্যামাকালী দেবী ও হেমাঙ্গিনী দেবী	(এটর্নি)	(কবিরত্ন ও রায়বাহাদুর	
(ইনি তিন এটর্নী ভ্রাতাদের নিয়ে	(১৮৯০-১৯১৭ সাল)	উপাধীতে ভূষিত হন)	
একটি এটর্নি ফার্ম চালু করেন।	+		
নিজেদের বাসস্থান বর্তমান	রাখালদাসী দেবী		
৯/১/১এ, ৯/২, ৯/৩, ৯/৪ ও ৯/৫			
পটুয়াটোলা লেনের রাস্তার দিকের			
উপর দ্বিতলের ঘরগুলি নিয়ে			
এক 'চেম্বার' চালু করেন।			
↓			

বেণীমাধব + শ্যামাকালী দেবী ও হেমাঙ্গিনী দেবী

(১৮৪৬-১৮৮৯ সাল)

↓

বিনোদ বিহারী (এটর্নি) + হেমাঙ্গিনী দেবী

(পরবর্তীতে ১৮৯০ সালে '৮নং, চিহ্নিত জমিতে নবনির্মিত ভবন প্রস্তুত করিয়ে, সেস্থানে আরও একটা 'পূজা' শুরু করেন। আজও 'দুটি ভবনে' এই বাৎসরিক উৎসব পরবর্তী প্রজন্ম করে চলেছেন।)

উপরিল্লিখিত ভ্রাতারা ও তাঁদের সুযোগ্য পুত্ররা বিভিন্ন ধরনের আইনি পরামর্শ ও আদালতে মামলার মাধ্যমে বহু ব্যক্তিকে ন্যায় বিচার পাওয়ার মাধ্যমে সংকট থেকে উদ্ধার করায় কৃতিত্তের সাথে ভূমিকা পালন করেছেন। এরমধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য মামলায়, বন্দ্যোপাধ্যায়" পরিবার, জানবাজার নিবাসী 'প্রীতম দাসের' পুত্র বধূ ও "রাজচন্দ্র দাসের" (প্রয়াত ১৮৩৬ সাল) "রাসমণি দেবী" এর পুত্র সন্তান না থাকার কারণে তৎকালীন 'ভারতীয় আইন' অনুসারে স্বামীর সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার পরিস্থিতি থেকে "আইনি লড়াই-এর মাধ্যমে তাঁকে (রাসমণি দেবীকে) ন্যায্য অধিকার পেতে সাহায্য করে। সেই সহায়তা তিনি আজীবন স্মরণে রেখেছিলেন ও প্রতি বৎসর "শারদীয়া উৎসবের মহা অষ্টমীর দিন, নিজ ভবনে পূজায় ব্যস্ত থাকা সত্বেও এই পরিবারের পূজা মণ্ডপে এসে দেবীকে প্রণাম করা সহ পরিবারের বয়ঃজেষ্ঠদের সাথে সৌজন্য বিনিময় করে যেতেন। এছাড়াও কাশিম বাজারের রাজ পরিবারের বাগান থেকে দীর্ঘদিন পূজার জন্য ফুল পাঠানো সহ সমাজের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগমে এই পরিবারের পূজা মণ্ডপ সদা ব্যস্ততায় ভরে উঠত। এর মধ্যে আর এক অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব "বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" এর কয়েকবারের উপস্থিতি এই পূজার গরিমাকে আরও উজ্জল করেছে।

বিপিন বিহারী (এটর্নি) + রাখানদাসী দেবী (১৮৯০-১৯১৭ সাল)

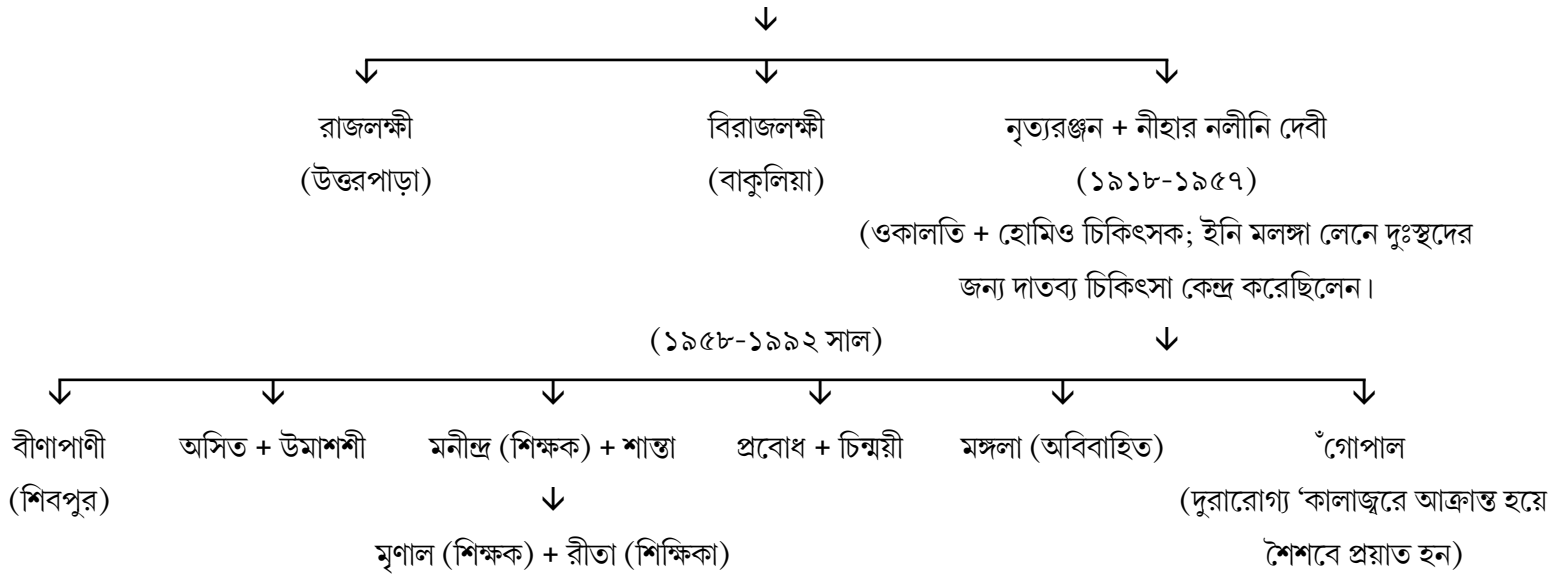

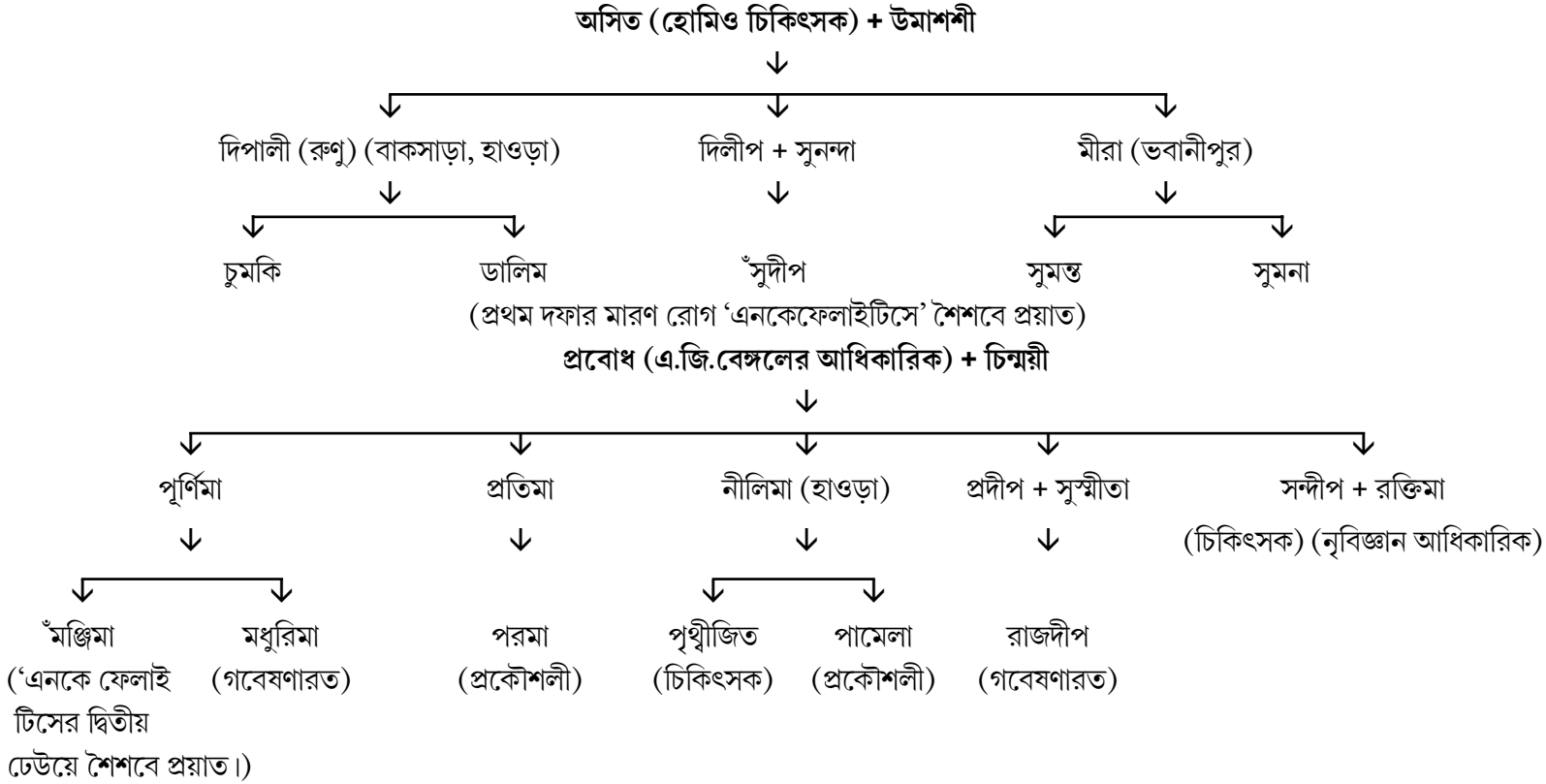

এই পরিবারে "আরাদ্ধা দেবী, যিনি "নগাঁর কালী" হিসাবে পূজিতা হন, দুর্গা পূজার কদিন তাঁর পূজার পরেই এই পরিবারের দালানে অধিষ্ঠিতা দশদিনব্যপী দেবী দুর্গার পূজা-অর্চনার কাজ শুরু করাটা এই পরিবারের রীতি হিসাবে আজও মেনে চলা হয়। পূর্বে এই পরিবারের পূজায় "ছাগ কুমড়ো ও আখ বলি দেওয়া" ও নবমীর দিন "কাদামাটি খেলার রেওয়াজ ছিল। বর্তমান 'শতকের' প্রথম দশকের প্রায় শেষ পর্ব থেকে ওইগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

৫৪ নং বাটীতে শুরু হওয়া পূজা (১৭৯১ সাল) থেকে বর্তমান ৯/২ বাটীতে স্থানান্তরিত হয়ে আজও (২০২২ সাল), অর্থাৎ ২৩২ বৎসর ও ৮নং বাটীতে ১৮৯০ তে শুরু হয়ে বর্তমান (২০২২ সাল) বৎসর অর্থাৎ ১৩৩ বৎসর ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ জিতেন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও উইকিপিডিয়া।

কপিনৃত্য না .....!!

মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরাকালে সরযূ নামক এক নদীর তীরে অযোধ্যা নামে এক জনপদ ছিল। দশরথ নামে তার এক নরপতি (নৃপতি) ছিলেন। তাঁর তিন রাণীর (পত্নীর) প্রথমা কৌশল্যার রাম নামে পুত্রকে দ্বিতীয় পত্নী কৈকেয়ীর মন্থরা নাম্নী এক কুমন্ত্রনাদাত্রী দাসীর প্ররোচনায় রাজ্যাভিষেকের পূর্বেই পিতৃসত্য রক্ষার্থে স্বইচ্ছায় সহযাত্রী হওয়া সহধর্মীনি ও বিমাতা সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে নিয়ে বনবাসে গমন ও তার পরবর্তীতে যৎপরনাস্তি দুর্ভোগ ও কিছুবা সুখানুভূতির সম্পর্কেও রামায়ণ পাঠক মাত্রই ইতিমধ্যে অবগত হয়েছেন। পাঠকরা এবিষয়েও জানেন এবং প্রকাশ্যে না হলেও অবশ্যই মানেন, যে আবহমানকাল থেকে নারী জাতির সোনালী রঙের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষেনর কথা। যার প্রমান ঐ মহাকাব্যের অন্যতমা চরিত্র সীতাদেবীর, পতি ও দেবর লক্ষ্মণের সর্তকবাণী ভুলে স্বর্ণমৃগ পাওয়ার আকূতির কারণে ঘটা দুর্বিপাকের বিবরণ ও সবিস্তারে পাঠক পাঠক কূল জানেন।

এর পরবর্ততিতে রামের সহধর্মীনিকে ফিরে পাওয়ার আকূতিতে সহমর্মিতার প্রমান স্বরূপ ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালী থেকে বিশাল বলশালী বিভিন্ন প্রজাতির কপিকুল সহ বিভিন্ন প্রাণীকূলের "কমরেড সুলভ" ভূমিকা পালন, এমন কি সীতহরণের নায়ক রাক্ষসরাজ রাবণের অনুজ বিভীষণের সহযোগীতায় শুরু হওয়া সীতা উদ্ধারে অভিযান, যুদ্ধ। যুদ্ধ পরবর্তী ঘটনা সকলেই অবহিত।

এইজন্যেই বোধহয় বাঙালীর এত বদনাম, হাতে 'মসি' পেলই মাথার পোকাগুলো কিলবিলিয়ে ওঠে আর মন বলে কিছুটা "ঘষি'। যাই হোক পাঠক, যুদ্ধে প্রচুর পরিশ্রম, বন্ধু হারানোর বেদনা ভুলে মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ সীতাদেবীকে উদ্ধারের আনন্দে উদ্বেল হওয়া কপিকূল প্রথম উদ্দাম নাচ নাচতে শুরু করল। তাই দেখে অন্যান্য প্রাণীকূলও যথাসম্ভব আনন্দ প্রকাশে অংশ নিল। ফল স্বরূপ অর্গলহীন উচ্ছাসে হীতা-হীত জ্ঞানশূন্য হয়ে যে যার হাতের কাছে যা পেরেছে তাই নিয়ে নৃত্য করে চলেছে, যারা নৃত্যে বিশেষ আগ্রহী নয় তবে উপভোগ করছে তারা বিভিন্ন জিনিষের জোগান দিয়ে বিষয়টাকে বর্ণিল করে তোলার মধ্যে দিয়ে ঘটনাকে উদ্‌যাপন ও উপভোগ করেছিল।

পাঠককূল শারদীয়া দুর্গাপূজাকে যে "অকালবোধন" নামেই জানেন সেটা বলার অপেক্ষা রাখেনা। ঐ আনন্দ প্রকাশের ঘটনা স্মরণে রেখে, নবমীর 'দিনের পূজা' শেষে যে সব স্থানে 'বলিদান' (মনুষ্যজাতির অন্তরের পশুবৃত্তির নিবৃত্তি করণের রূপক হিসাবে এই বলিদান প্রথা চালু হয়) হয় বা হোতো, সেখানের হাড়িকাঠ/হাড়কাঠ/যূপকাষ্ঠ তুলে দিয়েই শুরু হতো এই উদ্দাম নৃত্যের (এর সাথে বঙ্গের হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে বহু যূগ ধরে এক সামাজিক প্রথা আজও বহুপরিবারের মধ্যে চলে আসা এক প্রথার সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে আছে। প্রথাটা আমার কাছে অন্তত

বড়ই করুণ, জগৎজননী মা-এর আগমনে যখন সকলেই আনন্দ উপভোগ করছেন, ঠিক তখনই 'পতি হারা নারীদের', হাড়িকাঠ ভূমিতে প্রোথিত হওয়া থেকে শুরু করে নবমীতে সেটা উত্থিত না হওয়া পর্যন্ত দেবীপূজার অন্নভোগ ব্যতীরেকে কোন প্রকার অন্ন গ্রহণ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আবার পূজাও সর্বত্র হোত না বা হয়না, হলেও ব্রাহ্মণ বাড়ী ছাড়া অন্নভোগ দেওয়ার প্রচলনও ছিল না। তাই ঘরে ঘরে অসংখ্য 'মা' ঐকদিন নিরন্ন থাকতেন ও আজও থাকেন। পাঠকই বিচার করবেন প্রথাটি 'সূ' না 'কূ'।

উপরে উল্লিখিত ঐ নাচ (আনন্দ প্রকাশ) স্মরণে রাখতেই অকাল বোধনের এই প্রথাটিও চালু হয়।

অন্নভোগের প্রসঙ্গে মনে পড়ে 'কাকীমার' তত্ত্বাবধানে 'বিন্দুপিসি ঠাকুমা ও বালিগঞ্জের জেঠা ঠাকুমার' ন দিন "ব্যাপী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া 'দেবীর' অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুতের নিরলস প্রয়াস। রাত্রে 'শীতল' এর আয়োজন সই পরের দিনের প্রয়োজনীয় 'নারকেল নাড়ু' প্রস্তুতের সুবাস, 'মা' ও কয়েকজন 'জ্ঞাতি কাকীমার' ত্রস্ততার সাথে দেবী পূজার অন্যান্য উপাচার প্রস্তুতের তৎপরতা। সর্বোপরী "পিসির" (মঙ্গলা) শ্যেন দৃষ্টিতে, ধীর পদক্ষেপে সকল প্রকার ত্রুটিবিহীন ব্যবস্থাপনার পর্যবেক্ষণে পূজো বাড়ীর সর্বত্র গতায়তে সকলকে সচকিত করে রাখা।...

এ প্রসঙ্গে আমাদের পরিবারের (৯/২, বাড়ীর) পূজার বিভিন্ন সামাজিক প্রথার অংশ হিসাবে 'ঐ নাচের অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটনাগুলি আজও স্মরণীর হয়ে আছে— ৯/২ বাড়ীতে পল্লীর বহু বালক ও কিশোরের দল এসে ঐদিন উপস্থিত হয়ে পুরোহিত মহাশয় ও পরিবারে প্রবীণদের অনুমতি নিয়ে মাটি থেকে হাড়িকাঠ তুলে দিয়েই পড়ে থাকা মাটি পরস্পরকে মাখানোর মধ্যে দিয়ে নাচ শুরু করে কিছু পরে রওনা দিয়ে প্রথম "৮নং বাড়ীতে (বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের আর এক পূজা বাড়ী)" উপস্থিত হয়ে কিছুক্ষণ নৃত্য করে (ওঃ হো ভূল হয়ে যাচ্ছিল, ওদের সাথে সাথে আমাদের বাড়ীর ঢাকী ও তার সঙ্গে কাঁসী বাদক হিসাবে আসা ছোট ছেলে বা মলিন পোষাক পরিহিত মেয়েটি বাজাতে বাজাতে রওনা দিত) ফিরে আমাদের পূজা বাড়ীর পাশ দিয়ে পার্শবর্ত্তী রমানাথ মজুমদার স্ট্রীটের "বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য" পরিবারের বাড়ি প্রবেশ করে সেখানের 'হাড়ি কাঠ' তুলে কিছু সময় নাচের পরে এগিয়ে যেত পল্লীর সন্নিকটস্থ শ্রী গোপল মল্লিক লেনের উদ্দেশ্যে। যদিও মাঝে 'মদন মোহন ধর' বাড়ীর ও মির্জাপুরের 'ঘোষাল বাড়ীতে' পূজা হলেও (এ প্রসঙ্গে বলে রাখি, ঐ বাড়ীর এক ব্যক্তির নাম হয়ত অনেকেই জানেন, বিখ্যাত "অপরাধ বিশেষজ্ঞ" পঞ্চানন ঘোষালের নাম। তৎকালীন 'ব্রিটিশ সরকারের' দুঁদে ও দাপুটে পুলিশ অফিসার। তিনি 'উপরে দারোগা' ভিতরে রোগা (বিপ্লবীদের প্রতি অন্তরে অপত্য স্নেহের অধিকারী ছিলেন), ব্রিটিশ রাজও আজ এদেশে নেই, তাই বলতে শংকাও নেই, জনশ্রুতি আছে তিনি গোপনে বিপ্লবীদের অর্থ সাহায্যও করতেন অকাতরে। একেই বোধহয় বলে "বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা", তা না হলে তাঁদের বাড়ীর চৌহদ্দির পাশে থাকা "ফেভারিট

কেবিনের' পিছনে থাকা গোপন কুঠুরীতে অহরহ চলতো বিপ্লবীদের আনাগোনা, এমনকি গ্রেপ্তারী পরওয়ানা ঝুলত যাঁদের নামে তাঁরা নেতাজী সুভাষ, মাস্টারদাদের মতন অনেক বিপ্লবীদের অনায়াস যাতায়াত। প্রছন্ন প্রশ্রয় নিশ্চিতই ছিল, ঐ ভদ্রলোকের।)

প্রসঙ্গে ফিরে আবার স্মৃতিগুলোকে মুক্ত করে বলি, ঐ বাহিনি বাড়ী দুটিতে প্রবেশ করত না। বসুমল্লিক বাড়ীই থাকত এদের মূল আর্কষণের স্থান। এর কারণও হয়ত পূর্বোক্ত বাড়ীগুলির থেকেও উঠান ও চারিপাশ ঘিরে থাকা অনেকগুলি বিভিন্ন ভঙ্গিমার 'কাস্ট আয়রণের' পুতুল, তার উপরে চড়েও নাচত তরুণদের অনেকে, হ্যাঁ আর একটা আকর্ষণও ছিল বইকি। নাচ অল্প কিছু সময় এগুলেই ওই বাড়ীর কোনো এক কর্তা 'পট্টবস্ত্র' পরা অবস্থায় "দুনলা এক বন্দুক" নিয়ে উপস্থিত হলেই প্রত্যেকে যে যে অবস্থায় থাকত সেখানেই, সেই ভঙ্গীমায় স্থির হয়ে যেত। এ যেন সেই ছোটা বেলার স্টাচু-স্টাচু খেলা। এরপর তিনি বন্দুকটি উপর দিকে তুলে 'গুলি' ছুড়তেন যেই আবার শুরু হয়ে যেত নাচ। এরপরে তাদের ০গন্তব্য থাকত 'কর্পোরেশন অফিসের পিছন দিকে গলিতে থাকা "দয়াময়ীতলার" ঠাকুরবাড়ী, সেখানে অল্প সময় কাটিয়ে 'দেবীকে' প্রণাম করে তারা ফিরে আসত আমাদের পূজা প্রাঙ্গণে। তাদের এই নাচের সময় প্রতিটি বাড়ীতেই কারা যেন বালতি-বালতি জল ছুঁড়ে দিত আড়াল থেকে তাদের উদ্দেশ্যে, তাদের আর একটি আর্কষণের বস্তু ছিল, নাচের শেষে প্রতিটি বাড়ীতেই ওদের বিভিন্ন প্রকারের মিস্টি খাওয়ানো হোতো। এছাড়াও যে বাড়ীতেই

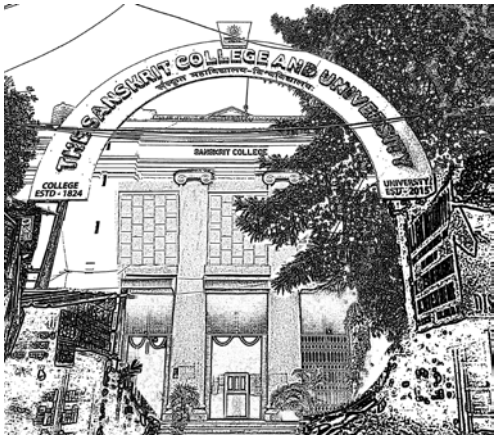

এরা যেত, সেই বাড়ীর ঢাকীরাও এদের সঙ্গী হোত পরবর্ত্তীর বাড়ীর উদ্দেশ্যে, তাদের কেও মিষ্টিমুখ করানো সহ বাড়ীগুলি থেকে বকশিশ ও পান-বিড়ি খাওয়ার জন্য কিছু অর্থও তুলে দিতেন তাঁরা।

ভীষণ রকমভাবে মন চাইলেও বাবার (মনীন্দ্র) দুর্বল দুই হাতের বজ্রকঠিন মুঠি দুটিতে ধরা থাকা আমরা দু ভাই, সন্টি ও আমি কোনোদিন নাচে অংশ নিতে পারিনি, আবার অবচেতনে থাকত 'জ্যাঠামশাই' (অসিত) ও কাকা (থুকু) বাবুদের পূজার কদিনের সেই কঠিন মুখগুলো, যেন পূজার অঙ্গ ও বংশমর্যাদা কোনো ভাবেই ক্ষুন্ন না হয়, তার প্রতি কঠোর দৃষ্টি আমাদের বাচাল হোতে দিত না। আর ছিল দাদা (দিলীপ) ও জনু কাকা, এই তিনজনের সাথেই ঐ দলটি সহ আমরা দু-জনে ঘুরতাম। আর ছোটভাই (ডাক নামটা নাই লিখলাম কালির আঁচড়ে। আজ 'পীড়িত'দের প্রয়োজনে, অর্জিত জ্ঞানের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের ও পরিবারগুলির উদ্বেগ মুক্তি ঘটানর মাধ্যমে অঞ্চলে বহুজনের

পরিচিত হয়ে উঠেছে সে) সন্দীপ তখন অকেটাই ছোটো থাকার কারণে বাবা ওকে সঙ্গে নিত না। বিগত শতকের সাতের দশকের প্রায় পর্বে ঐ ক্রীড়ায়রত একজন পড়ে গিয়ে আঘাত পাওয়ায় পরিবারের পক্ষে ঐ খেলাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কাদামাটি নিয়ে খেলার কারণে অনুষ্ঠানের নাম 'কাদামাটি খেলা', বিচিত্র ভঙ্গিমায় প্রায় ভূতের মতন নাচকে, পল্লীর অন্যান্য পরিবারের কিছু প্রবীণ 'বাঁদরামো' বলে অবিহিত করতেন। যারা সে দৃশ্য চাক্ষুস করেননি বা আর করতেও পারেনা, তাদের উদ্দেশ্যে বলি "ঐ আনন্দের কোনো ভাগ হবে না।"

রইল পরে অনেক না বলা কথা বলার ইচ্ছা, আপাত শুধু কামনা রইল দুই শতাধিত বছরেরও বেশী সময় ধরে চলে আসা এই বৃহত পরিবারের পুত্র কন্যা নির্বিশেষে মানব কল্যাণের অংশীদার হওয়ার কাজে ভূমিকা পালনে সদা সচেষ্ট থাকার কাজকে "আগামী প্রজন্ম' আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে ঐ দৃঢ়-প্রত্যয়। নিয়ে, ঐ প্রসঙ্গে বলি "ভিন্ন পারিবারিক পরিমণ্ডল" থেকে আসা 'কূলবধূ'দের পূর্বে 'অন্তরাল' থেকে করা বা বর্তমানে বাসস্থানের 'চৌকাঠ' পেরিয়ে বর্হিজগতে ছড়িয়ে থাকা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে যুক্ত থেকে মানব সমাজের 'ভালো থাকা' ও 'ভালোলাগার' স্বার্থে কাজ করে যাওয়ার কথা সুযোগ এলে অন্য পরিসরে জানানোর বিষয়গুলি নিয়ে আগামী প্রজন্মের কাজ করার আগ্রহকে কিছুটা 'উস্কে' দিতেই এই 'অবতারণা'।

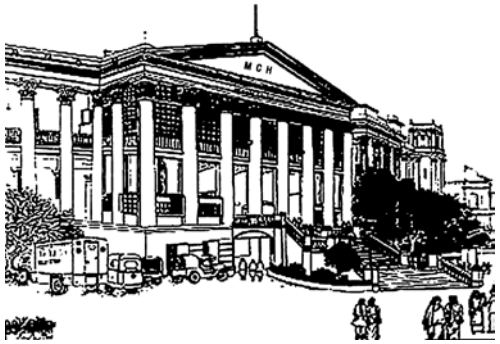

বলা হোলো না পল্লীকে ঘিরে থাকা বিশ্বখ্যাত 'বইপাড়া' এর কথা, হল না চারিপাশের বিভিন্ন 'স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির' কথা, পড়ে থাকল ২৪ **X** ৭ ঘন্টা জেগে থাকা দেশের সুপ্রাচীন "মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের" কথা। সরকারী আহ্বানে—বন্যপ্রাণীদের 'গৃহ অভ্যান্তরে না রেখে '৮' নং বাড়ীর ময়ূরগুলির কয়েটিকে উদ্দোগ নিয়ে রেখে আসা ঐতিহাসিক 'শ্রদ্ধানন্দ পার্ক', যেখানের সভায় নেতাজী সুভাষের কলকাতাবাসীদের জানানো আহ্বাহানে দেশপ্রেমে আরও উৎসাহের সাথে যুক্ত হওয়া বা 'কলেজ স্কোয়ার', তার উত্তরে অবস্থিত 'ঈশ্বরচন্দ্রের' কর্মভূমি 'সংস্কৃত কলেজ (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়) বা পূর্বে থাকা 'বৌদ্ধ মন্দির' এর কথা। তাই 'মান্না দের' কণ্ঠে গাওয়া সেই 'কফি হাউস' (আলবার্ট হল) নিয়ে গানটির কয়েকটি শব্দ উল্লেখ করলাম—

একই সে বাগানে আজ
এসেছে নতুন কুঁড়ি
শুধু সেই সে দিনের মালী নেই

প্রথম বাঙালি অ্যাটর্নি

শ্রী চিত্র গুপ্ত

কলকাতার প্রথম বাঙালি অ্যাটর্নি বেণীমাধব ব্যানার্জি। কালের গতিতে বেণীমাধব এক বিস্মৃত ব্যক্তিত্ব। তবু তিনি ইতিহাস হয়ে আছেন। এই প্রতিভাধর আইনবিদের জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। নানারকম রোগের প্রকোপে অকালে তাঁর জীবনদীপ নিভে গিয়েছিল। কিন্তু প্রথম বাঙালি অ্যাটর্নি হিসাবে তিনি বেঁচে থাকবেন আদালতের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে।

বেণীমাধবের জন্ম মধ্য কলকাতার পটুয়াটোলা অঞ্চলে ১৮২৭ সালে। তিনি ছিলেন বাবার জ্যেষ্ঠ সন্তান। তাঁর বাবা তারাচাঁদ ব্যানার্জি ছিলেন সেকালের কলকাতার এক অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। কর্মসূত্রে তিনি ছিলেন কোম্পানির বেনিয়ান। বেণীমাধবের পড়াশুনা শুরু হিন্দু কলেজে। সেখান থেকে সসম্মানে পড়াশুনা শেষ করে তিনি ১৮৪২ সালে সেকালের বিখ্যাত রেমফ্রি অ্যান্ড কোম্পানি অ্যাটর্নির অফিসে কেরানির কাজে যোগ দেন। শীঘ্রই তিনি হেড ক্লার্কের পদে উন্নীত হন। অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ছিলেন বলে তিনি অ্যাটর্নি হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২২ বছর। সেটা ছিল কলকাতার সুপ্রীম কোর্টের যুগ। চাকরি ছেড়ে তিনি ইংরেজ অ্যাটর্নি হেনরী ওয়েনের কাছ শিক্ষানবিশি শুরু করলেন। তারিখটা ছিল ১৮ অক্টোবর ১৮৪৯। অত্যন্ত মেধাবী বেণীমাধব শিক্ষাকালের সময়সীমা পার হওয়ার আগেই কৃতিত্বের সঙ্গে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। প্রথম বাঙালি অ্যাটর্নির সম্মান লাভ করার জন্য চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। তাঁর এই কৃতিত্বের জন্য ইংরেজ ব্যবহারজীবীরা অত্যন্ত প্রীত হলেন। সে সময়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন স্যার লরেন্স শীল। সুপ্রিম কোর্টে অ্যার্টনি হিসাবে নথিভুক্ত হওয়ার জন্য বেণীমাধব তাঁর কাছে আবেদন করলেন ২২ জানুয়ারি ১৮৫২ সালে। সঙ্গে দিলেন তাঁর বংশ পরিচয় ও বেশ কিছু প্রশংসাপত্র। খ্যাতনামা উকিল প্রসন্ন কুমার ঠাকুর একটি পত্রে বেণীমাধবের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পেশার অনুমোদন পাওয়ার পর উইলিয়াম হেনরী ওয়েন বেণী মাধবকে অংশীদার নিলেন। প্রতিষ্ঠানের নাম ওয়েন অ্যান্ড ব্যানার্জি।

দুভার্গ্যের বিষয় আইন ব্যবসায়ে প্রবেশের মাত্র সাত বছর পরে ১৮৫৯ সালের ৫ জুলাই তারিখে বেণীমাধবের অকালমৃত্যু হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩২। পেশা শুরু করার কয়েক বছর আগেই বেণীমাধব বিয়ে করেছিলেন। বাবা দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন। বালিকা বধূর নাম ছিল শ্যামাকালী। আট বছরের ছেলে বিনোদ বিহারী ও ২ বছরের মেয়ে মীরারাণী কে রেখে শ্যামাকালী মারা যান ১৮৪৬ সালে। এক বছরের মধ্যে ১৮৪৭ সালের

জানুয়ারি মাসে বেণীমাধব দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন পনের বছর বয়সের হেমাঙ্গিনী দেবীকে। মৃত্যুর প্রায় বছরখানেক আগে বেণীমাধব প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রবল জ্বর ও মৃগীর লক্ষণ দেখা দেয়। কিছুদিন পর আবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী হন। মেডিকেল কলেজের ডাক্তার রিচার্ড ও রামনারায়ণ দাস তাঁর চিকিৎসা করেন। ১৮৫৯ সালের মে মাসে পটুয়াটোলার বাড়ি থেকে এসপ্লানেড রোডে তাঁদের অন্য এক বাড়িতে চলে যান। স্ত্রী ও বাড়ির লোকজন সেখানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সেখানে তাঁর রোগের কোনও উপশম দেখা গেল না। তাঁর চিকিৎসার জন্য প্রেসিডেন্সী সার্জন ড: শুভিভ ও ড: অ্যালান ওয়েভকে ডাকা হল। কিন্তু তাঁদের চিকিৎসাতেও এই অজানা রোগের কোনও উপকার পাওয়া গেল না এবং দিন দিন তিনি আরও দুর্বল হয়ে পড়লেন এবং অবশেষে ১৮৫৯ সালের ৫ জুলাই বেণীমাধব মারা গেলেন। মৃত্যুর আগে আরও তিনজন দেশীয় ডাক্তার দেখানো হয়েছিল। তাঁরা হলেন উমাচরণ রায়, হারাধন সেন এবং নারায়ণ রায়। তাঁদেরও সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

অসুখের সময়ে, বেণীমাধবের অংশীদার ওয়েন সাহেবও তাকে একদিন দেখতে দিয়েছিলেন। তখন বেণীমাধব শেষ শয্যায়। বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। সাহেবকে তিনি কোনও কথাই বলতে পারেননি। ওয়েন বুঝেছিলেন তার আরোগ্যলাভের কোনই আশা নেই।

সমস্যা দেখা দিল বেণীমাধবের মৃত্যুর পর। ঘরে তাঁর নাবালিকা স্ত্রী হেমাঙ্গিনী, একটি শিশুপুত্র ও একটি শিশুকন্যা। সম্পত্তির বিলি অবস্থা সম্বন্ধে, এ বিষয়ে হেনরী ওয়েন বললেন, বেণীমাধব মৃত্যুর আগে কোনও উইল করেছিলেন কিনা তাঁর জানা নেই। তাঁর অফিসের কাগজপত্রের মধ্যে তিনি কোনও উইল দেখতে পাননি। অবশেষে বাড়িতে অনেক খোঁজ করার পর বেণীমাধবের উইল পাওয়া গেল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে তিনি নিজেই সেই উইলটি নাকচ করেছেন। উইলটি তিনি করেছিলেন ১৮৫৪ সালের ৪ আগস্ট তারিখে। তার বয়ান ছিল—আমি পটুয়াটোলা নিবাসী বেণীমাধব ব্যানার্জি, অ্যাটর্নি, এটাই আমার শেষ উইল বা চরম ইচ্ছাপত্র। আমি আমার একজিকিউটরদের নির্দেশ দিচ্ছি যে আমার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তারা আমার আসবাবপত্র লাইব্রেরি ও সোনারুপার জিনিসপত্র যা আমার বাড়িতে ও ২৪ পরগণার সুলতানপুরে রক্ষিত আছে তা বিক্রি করে দেবে। আমার নিজস্ব বাগানও তারা বিক্রি করবে। সেই টাকা থেকে আমার সৎমা দীনময়ী দেবীকে চারশো টাকা দেবে। আমার পিসিমা শ্রীমতী ধনিমণি দেবীকে চারশো, ঠাকুর মহাশয় রামকানাই তর্কচূড়ামণিকে দুশো, আমার তিন বোন হেমাঙ্গিনী দেবী, রাজরাজেশ্বরী ও যোগমায়া প্রত্যেককে একশো, আমার ভাগিনেয় প্রসন্নকুমার চ্যাটার্জিকে একশো, আমার দুই সৎ ভাই যোগেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি ও কৃষ্ণধন ব্যানার্জিকে তারা সাবালক হওয়ার পর পাঁচশো টাকা হিসাবে পাবে। আমার স্ত্রী শ্যামাকালী দেবীকে এককালীন তিন হাজার টাকা দেওয়া হবে। আমার ভাই

একজিকিউটর উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জি পাবে একহাজার টাকা। নবগ্রামে কালীমন্দিরের জন্য দুশো টাকা খরচ করা হবে। আমার নাবালিকা মেয়ের জন্য পাঁচশো টাকা গচ্ছিত রাখা হবে। আমার নাবালক ছেলে ১৮ বছর বয়সের পর আমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। সে সময়ে বেণীমাধবের সম্পত্তির দাম ছিল পঁচাত্তর হাজার টাকা।

যাই হোক, বেণীমাধবের ভাই উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জি সেই নাকচ করা উইলখানি নিয়ে আদালতে হাজির হলেন। সেই উইলের ব্যাপারে প্রাণকৃষ্ণ ব্যানার্জি নামে একজন হলফনামা পেশ করলেন আদালতে। তিনি ওয়েন সাহেবের অফিসে কেরানির কাজ করতেন। তিনি বললেন, আমি কলকাতার; রামবাগানের বাসিন্দা প্রাণকৃষ্ণ ব্যানার্জি আমি ও জন ব্যাপটিস্ট ৮ এপ্রিল ১৮৫৪ সালে বেণীমাধবকে উইলে সই করতে দেখেছি এবং হলফ করে বলতে পারি সেটি তাঁর আসল ইচ্ছাপত্র।

আদালত বেণীমাধবের সেই উইল গ্রাহ্য করেনি। তার ভাই এর আবেদন অনুযায়ী তাকে আদালত লেটার্স অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দেয় এবং নাবালক ও নাবালিকাদের যোগ্য অভিভাবক নিযুক্ত করে। সেই আদেশ বলবৎ থাকবে যতদিন তারা সাবালক না হয়। সম্পত্তি রক্ষা করার ব্যাপারে উমেশকে একটি অঙ্গীকারপত্র আদালতে জমা দিতে হয়। ১৮৫১ সালের ১০ আগস্ট তারিখে এই উত্তরাধিকার বিষয়ে আদালত চরম মতামত জানায়। বেণীমাধব ব্যানার্জি স্মরণীয় হয়ে রইল কলকাতার প্রথম বাঙালি অ্যাটর্নির মর্যাদা নিয়ে।

তথ্য ঃ মেয়র কোর্ট থেকে হাইকোর্ট

ইনকরপোরেটেড ল সোসাইটি

(মেয়র কোর্ট থেকে হাইকোর্ট বই থেকে সংগৃহিত)

চিত্র গুপ্ত

১৮৪৮ সালের ১ মার্চ তারিখে সুপ্রিম কোর্টে অ্যাটর্নিদের প্রবেশের ব্যাপারে বিধিনিষেধের কিছু রদবদল করা হয়। তখন বিলেতের অ্যাটর্নি ছাড়াও এখানে আইন পেশায় নিযুক্তদের প্রবেশ স্বীকৃত হয়। তার একবছর পরে ১৮৪৯ সালের ১৮ জুলাই কলকাতায় অ্যার্টনিশিপ পরীক্ষার প্রবর্তন হল। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি পরীক্ষকদের বোর্ড গঠন করলেন। সেই বোর্ডের প্রথম সদস্যদের তালিকায় ছিলেন লংভিল ক্লার্ক, জন কক্রেন, জন রেডি, টমাস ক্রম সুইনতো, রবার্ট ম্যালয় ও জন নিউমার্চ। পরীক্ষার ব্যাপারে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল, বয়স একুশ বা তার ওপরে হলে কোন সিনিয়রের কাছে তিন বছর শিক্ষানবিশীর পর প্রার্থী পরীক্ষায় বসার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এই পরীক্ষারীতির পর সুপ্রিম কোর্টে প্রথম বাঙালি অ্যাটর্নি পটুয়াটোলার বেণীমাধব ব্যানার্জি সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ১৮৪৯ সালের ১৮ জুলাই তারিখে তার কৃতকার্য্যতার খবর প্রকাশিত হয়। সেটা অবশ্যই একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

ক্রমে অ্যাটর্নির সংখ্যা বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে মামলা মোকদ্দমা। আইনের বই-এর জন্যে একটা গ্রন্থাগার অবশ্য-প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। তার ফলে ১৮৫১ সালে অ্যাটর্নিরা তাঁদের নিজস্ব লাইব্রেরি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এ বিষয়ে ওপর মহলে আলোচনা শুরু করার পর ১৮৫২ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রধান বিচারপতির অনুমতি পাওয়া যায়। সুপ্রিম কোর্টের অ্যাটর্নিরা নিজেদের চাঁদার টাকায় গড়ে তুললেন ক্যালকাটা অ্যাটর্নিজ অ্যাসোসিয়েশন। ১৮৬০ সালে আরও দুজন ভারতীয় অ্যাটর্নি গিরিশচন্দ্র ব্যানার্জি ও পূর্ণচন্দ্র মুখার্জি সভ্য হলেন। স্বনামধন্য ব্যারিস্টার ও রাজনীতিবিদ ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জি গিরিশচন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র। তারপর বাঙালি অ্যটর্নিদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে লাগল। নাম লেখালেন মুরলীধর সেন, উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জি, কালীনাথ মিত্র, নরেন সেন, গণেশ চন্দ্র চন্দ্র, মোহিনী মোহন চ্যাটার্জি, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী প্রমুখ।

আজকের ইনকরপোরেটেড ল সোসাইটির জন্ম হয় ১৯০৮ সালে। এই নাম বদলের প্রস্তাব এনেছিলেন ক্যালকাটা অ্যাটর্নিজ অ্যাসোসিয়েশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান এইচ সি এডগার ও অন্যতম সভ্য এফ এম লেসলী। সেই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। রূপান্তরিত সংস্থার সভাপতি হলেন এইচ সি এডগার। সমিতির সভ্য হলেন কালীনাথ মিত্র, এইচ ডব্লিউ স্পার্কস, এন সি বসু, অর্পূব কুমার গাঙ্গুলী, এ এফ এম লেসলী।

কালের রথচক্রের সতত আবর্তনে কেটে গেছে দীর্ঘ দিন। সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ইনকরপোরেটডল সোসাইটি শতবর্ষ পেরিয়ে গেছে। জগৎ পরিবর্তনশীল দেশের প্রচলিত নিয়মকানুনও কাল ও দেশাচারের পথ ধরে চলে। পরিবর্তনের স্রোতে ভাসতে ভাসতে নিয়মেরও রূপান্তর হয়। পালাবদলের এক লগ্নে কলকাতা হাইকোর্টে অ্যাটর্নিপ্রথা বিলুপ্ত হল। যাঁরা ছিলেন তাঁরা রইলেন। পরীক্ষা-রীতি বন্ধ হয়ে গেল। পরিশোধিত হল অ্যাডভোকেট অ্যাক্ট। সেই ব্যবস্থা কার্যকরী হল ১৯৭৭ সালের ১ জুলাই থেকে। সেই সংশোধিত আইনে অ্যাটর্নিরা অ্যাডভোকেট নামেও অভিহিত হলেন। ছেদ পড়ল সুদীর্ঘ দিনের একটি প্রচলিত ব্যবস্থার। অ্যাটর্নি প্রথা বিলুপ্ত হলেও কালের সাক্ষী হয়ে থাকবে ঐ সোসাইটি। আজ এর সদস্য সংখ্যা পাঁচশোর বেশি। অসংখ্য ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন বই-এর সম্ভারে এই লাইব্রেরি গর্বিত। সারা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগ্রহশালা। আজকের এই সমিতি শুধুমাত্র অ্যটর্নি লাইব্রেরি নয়। অ্যাটর্নি ও অ্যাটর্নি ও অ্যাডভোকেটদের একটি যৌথ সাস্বত মিলন মন্দির।

কলকাতা ৩০০ বৎসর

১০০ বছরের স্মরণীকা পত্রিকা

৮ নং, পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

আমাদের ১০০ বৎসর

১২৯৭—১৩৯৬

কলকাতার ৩০০ বৎসর আমাদের ১০০ বৎসর

১৯৮৯ সাল। কলকাতার বয়স হল তিনশ বছর। বছরের প্রথম দিনটি থেকেই মহানগরীর মানুষ মেতে উঠল কলকাতাকে সাজাতে। সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল কালের বিবর্তনের জীবন্ত দলিল এই কলকাতা শহরের ঐতিহ্য সম্বন্ধে নগরবাসীকে সচেতন করতে। শাসক সরকার নতুন উদ্যোগে শহরকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেরামত করতে শুরু করলেন। সন্ধ্যের পরেই শতসহস্র বিদ্যুতের বাতিতে ঝলমলিয়ে উঠল গোটা কলকাতা। ঘোড়ায় টানা সাবেকি ট্রাম মনেকরিয়ে দিল পুরানো কলকাতার সেই ছবি। এককথায় তিলোত্তমা।

কলকাতার ত্রিশত বর্ষের আনন্দে-উন্মাদনায় মানুষ যেন আটখানা। কলকাতা ত্রিশত-বর্ষ উৎসবে আরো একমাত্রা যোগ করল বাঙালীর চিরন্তন আনোন্দোৎসব দুর্গাপূজা। শরতের টুকরো টুকরো সাদা মেঘ এবারেও নিয়ে এল আনন্দের কলতান। আগমনী গানে মুখরিত হল বাংলার আকাশ বাতাস পাড়ায় পাড়ায় জোড় কদমে শুরু হল মেরাপ বাঁধা। কুমারটুলির প্রতিমা শিল্পীরা স্নিগ্ধ রোদে পিঠ ছুঁইয়ে তন্ময় হয়েছে প্রতিমা নির্মাণে। চন্দননগরের আলোকসজ্জাকারীদের ডাক পড়ল কলকাতার এবারের আলোকসজ্জার বৈচিত্র্য আনতে, তাই আলোকচিত্রে রামায়ন মহাভারত, বিশ্বামিত্রের এপিসোডাল সিরিয়ালের পাশাপাশি কলকাতার তিনশ' বছরের ধারাবাহিক সমারোহ। জোব চার্নক জাহাজ থেকে নামছেন, কলকাতার বাবুবিবিদের স্নান যাত্রা, জুড়িগাড়ি, পালকি আরও কত কি।

এই কলকাতার তিনশ বছরের পাশাপাশি ফুটে উঠেছে আমাদের দুর্গোৎসবের শতবর্ষের চালচিত্র কলকাতার তিনশ বছরের প্রাচীন আয়নায় আমরা দেখলুম আমাদের শতবর্ষের প্রতিচ্ছবি।

সেই কবে ১৮৯০ সালে প্রথম ভারতীয় এটর্নী ৺বেনীমাধব বন্দোপাধ্যায় এই পূজার চালচিত্রের সূচনা করেছিলেন ৮নং পটুয়াটোলা লেনে। তিনি ছিলেন Owen & Boonerjee এটর্নী সংস্থার অন্যতম স্বত্বাধিকারী। তদানিন্তন বর্ধিষ্ণু প্রায় সব পরিবারই ছিল তাঁর মক্কেল। যেমন রানী রাসমনী, শোভাবাজারের দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কেশবচন্দ্র স্ট্রীটের দিগম্বর মিত্র এবং মার্বেল প্যালেসের মল্লিকেরা। এরা সকলেই পূজা অনুষ্ঠানে আসতেন নিমন্ত্রিত হিসেবে। বসত গানের আসর, ঝলমল করে উঠত বেলোয়ারী ঝাড়, এছাড়া চলত চারদিন ধরে দরিদ্র নারায়ণ সেবা, অন্ন বিতরণ আরও কতকি।

চিরাচরিত প্রথায় ভক্তিরস সহকারে আজও এই পূজা হয়ে আসছে। সময় তো দাগ দিয়ে গেছে মুখবয়বে। চিড় ধরেছে আয়নার পারায়, তবু এর স্বাদ আলাদা। বার্ধক্যে পৌঁছে শীতের সকালে রোদে পিঠ রেখে খেজুর রস খাওয়ার মত—প্রথম যৌবনের উন্মাদনায় কোথাও যেতে যেতে আচমকা সিগন্যালিং-এ ট্রেন থেমে গেলে তল্পিতল্পা ঘাড়ে ফেলে "কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা" গোছের ভাবনায় যেখানে সেখানে চলে যাওয়ার মত। বাল্যকালে কালবৈশাখির দাপটে একদিকে ভয়, অন্যদিকে আনন্দ, বিহ্বলতা মিলিয়ে মিশিয়ে আম কুড়োতে যাওয়ার মত। তাই এই ফিরে দেখা, তাই এই থমকে দাঁড়ানো—তাই এই স্মরণিকা

প্রচীন পরিবারে

মধ্য কলকাতার একটি প্রাচীন পূজো ৮নং পটুয়াটোলা লেনের বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির পুজো। বেণীমাধব ছিলেন ভারতের প্রথম অ্যাটর্নি। শোভাবাজারের দেব এবং রাণী রাসমণির অ্যাটর্নি ছিলেন তিনি। সেকালে শহরে অনেক গণ্যমান্য মানুষের ভিড় জমত পটুয়াটোলা লেনের বাঁড়ুজ্যে বাড়িতে। এখন অধিকাংশ দর্শনার্থীদের ভিড়ই বারোয়ারীতলায়। তবু এদিক ওদিক ঠাকুর দেখতে গিয়ে মাঝে পুরনো দুর্গোদালানগুলিতে উঁকি দেওয়া ভাল। কেন না, সব বাড়িতেই কি প্রতিমা, কি পূজোবিধি সবই হারানো ঐতিহ্যের স্মারক।

আনন্দবাজার পত্রিকা
৪ঠা অক্টোবর ১৯৮৯

The union minister of state for revenue, Mr. Ajit Panja will in agurate a 100-year-old Durga Puja at 8, Patuatala Lane in central Calcutta on october 6. A cultural Programme will be organised on cctober 9. Renowheel singer Ramkumar Chattopadyay will perfarm.

The Telegraph.
4th october 1989

প্রধান অতিথির ভাষণ থেকে

আজকের এই আনন্দযজ্ঞের মঙ্গলানুষ্ঠানে এই মহাদেবীর আবির্ভাব লগ্নে এই ৮ নং পটুয়াটোলা লেনের বাড়ীর দুর্গাপূজার শতবর্ষ অনুষ্ঠানে সকলের সঙ্গে নিজেকে সঙ্গী করে নিতে পেরে গর্ববোধ করছি।

এই বাড়ীতে একশ বছর ধরে বহু গুনী ব্যক্তির সমাবেশ হয়েছে যাদের মধ্যে অনেকেই আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ। এ বাড়ীর সঙ্গে আমাদের পরিবারের পরিচয়ের সূত্র সেই সাবেকী আমল থেকে। ইত্যবসারে কলকাতার অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে, সাবেকী কলকাতার পরিবেশ প্রায় নেই বললেই চলে।

খুঁজে পেলে বুক ভরে ওঠে যদি কোথাও সেই পুরোন ধারা খুঁজে পাই। এবাড়ীর অনেক উত্থানপতন অনেক ভাঙাগড়া, অনেক ভালমন্দর মধ্যেও বিত্তমান সেই সূচনার স্মৃতি ও স্মারক "দুর্গাপূজা"। এবাড়ীর পূজার সূচনা হয়েছিল ১২৯৭ বঙ্গাব্দে। প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীযুক্ত বাবু ৺বেনীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় এটর্নি। যে বিরল নজীর এই ৮নং পটুয়াটোলা লেনের সিন্দুকে আজ স্থান পেল, এলাকার মানুষ বহুদিন মনে রাখবে।

আমাদের সাধের এই কলকাতা, ৩০০ বছর যার বয়স—আমরা বাঙালী তাই নিয়েও বিতর্ক শুরু করে দিয়েছে। কেউ বলছি ২৯৯ বছর আবার কেউ বলছি ৩০১ বছর। বিতর্ক বিস্তর, কিন্তু ৮নং পটুয়াটোলা লেন যার কাছেই বলেছি তারা সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীটাকে নির্দেশ করেছে। এর কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও নানা রঙের ইতিহাসের জন্যে। কলকাতাকে আমরা বড়ই ভালবাসি—"Calcutta I love you". কলকাতাকে ভালবাসি এজন্য যে আপনাদের আশীর্বাদে ও শুভেচ্ছায় পৃথিবীর অনেক শহর ঘুরেছি, গাড়ি আছে, বাড়ী আছে—কোনও অভাব নেই, কিন্তু এরকম আনন্দের জায়গা মানুষের প্রতি মানুষের সুন্দর ব্যবহারের জায়গা, বিশ্বাস করুন কোথাও নেই : এই কলকাতাতেই এই বাড়ীটি বিরাট ঐতিহ্য নিয়ে আছে।

"একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু
চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ. বলে যেন বিনু
চেয়ে দেখি ঠোকাঠুকি বরগাকড়িতে
কলিকাতা চলিছে নড়িতে নড়িতে॥"

কলকাতা নড়তে নড়তে ছুটতেই থাকুক, তাই শ্রীমতী কনকলতা দেবীর কাছে আমরা আশীর্বাদ চেয়ে নিচ্ছি, সাধের কলকাতাকে আরও আধুনিক করার জন্য যে প্রচেষ্টা শুধু হয়েছে যাতে সবরকম ভাবে আমরা সফলতা অর্জন করি। আরও একটা আশীর্বাদ চেয়ে নেব মার কাছে—কলকাতাকে একনম্বর স্থানে নিয়ে যেতে হবে। আজ মহা ষষ্ঠীর দিনে মায়ের কাছে প্রার্থনা পশ্চিমবাংলার যুবশক্তিকে তিনি সাহস দিন। সাহস এলে শক্তি আসবে আর শক্তি মানেই সফলতা। আমার বিশ্বাস আমরা আশীর্বাদ পাবই। সকলকে আমার শত শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে, গুরুজনদের প্রণাম জানিয়ে এখানেই শেষ করছি। বন্দেমাতরম্—

নমস্কারান্তে
অজিতকুমার পাঁজা
(কেন্দ্রীয় মন্ত্রী)

১৯শে আশ্বিন ১৩৯৬
ইং ৬ই অক্টোবর ১৯৮৯

ব্যবস্থাপনায় ঃ—

শ্রীযুক্ত	প্রভাতকুমার	বন্দ্যোপাধ্যায়।	(রাজা)
"	সুবোধ "	"	(মানু)
"	সুনীত "	"	(ভুঁটাই)
"	সুশীল "	"	(পতাই)
"	সুধীর "	"	(হরি)
"	সমীর "	"	(কাকা)
"	মহাদেব "	"	(খুচি)
"	বুদ্ধদেব "	"	(ওস্তাদ)
"	অরুণদেব "	"	(অজুন)
"	সলিল "	"	(শৈল)
"	সমরেশ "	"	(রবি)
"	সুবীর "	"	(সুবনারাণ)
"	সন্দীপ "	"	(ছোটে কা লণ্ডন)
"	সুমিত "	"	(নেবুলাল)
"	মুকুল "	"	(দুনিয়া মালিক)
"	সুজয় "	"	(ভুতপুড়িয়া)
"	শোভন "	"	(পাদো)
"	অমিতাভ "	"	(কোগো)
"	শান্তনু "	"	(লিপনবাবু)
"	সৌমেন "	"	(বড় বুড়ো)
"	শৌভিক "	"	(ছোট বুড়ো)
"	প্রবাল "	মুখোপাধ্যায়	(রসমুণ্ডি)
"	রাণা "	"	(পাগলা)
"	শৈবাল "	"	(বাজপেট্টি)

যাদের না নিলে নয় ঃ—

টুটুন (বাণ্টু সর্দার)
বাবিন (বাচ্চিন্)
টবিন (বিচ্ছু)
রবিন (পুঁচকে)

কলাকুশলীবৃন্দ ঃ—

শ্রী যোগেশচন্দ্র পাল (মৃৎ-শিল্পী-কুমারটুলি)
শ্রী দেবাশিস নন্দী (প্রাঙ্গন সজ্জা)
শ্রীমতী সন্ধ্যা নন্দী (পত্র অঙ্কন ও পরিচয় লিখন)
শ্রী বিশ্বজিৎ সরকার (ধ্বনি)
শ্রী আশিস চক্রবর্তী (আলোক সজ্জা)
শ্রী সমীর কুমার গুইন (ভিডিও)
শ্রী কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় (স্থির চিত্র)
মেসার্স—রাধারমণ ডেকরেটর্স
কুল পুরোহিত—শ্রী বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য।
এবারে পৌরোহিত্য করেছেন—শ্রী সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পীবৃন্দ ঃ—

নাসির হোসেন (সানাই)
সুর ভারতীর শিল্পীবৃন্দ (আগমনী গীতিআলেখ্য)
শ্রীমতী ইলা বন্দ্যোপাধ্যায় (কণ্ঠ সঙ্গীত)
শ্রীমান নীলোৎপল মুন্সী (যন্ত্র সঙ্গীত)
শ্রী দেব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (হারমনিয়াম)
শ্রীমতী দীপা সাহা (কণ্ঠ সঙ্গীত)
শ্রীযুক্ত সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় (আধুনিক)
শ্রীযুক্ত নীলাদ্রী শেখর বসু (আবৃত্তি)
শ্রীমতী শুভ্রা বসু („)
শ্রীযুক্ত রামকুমার চট্টোপাধ্যায় (পুরাতনী সঙ্গীত)
শ্রীযুক্ত প্রবাল মুখোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

কলিকাতা হাইকোর্ট
দূরদর্শন কেন্দ্রে, দিল্লী
আনন্দবাজার পত্রিকা
ও টেলিগ্রাফ
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রীয় বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত অশোক বসু মল্লিক
এবং
রাজভবন (কলিকাতা)

যাদের অণুপ্রেরণায় এই পূজা শতবর্ষে পদার্পণ করল ঃ—

শ্রীমতী কনকলতা দেবী।
শ্রীমতী শান্তিলতা দেবী।

যাদের নিয়ে এই পূজা ঃ—

শ্রীমতী গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমতী অরুণা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমতী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমতী আভা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমতী সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমতী বনানী বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমতী সর্বানী বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমতী ফাল্গুনী বন্দ্যোপাধ্যায়
এবং শর্মিলা (পুঁটি)
সুপ্রিয়া (টুনি)
সোমজিতা (টোঁপি)
জয়িতা (মাউন ব্যাটেন)

দূর্বাঘাসের বুকের উপর শিউলি ঝরা সকাল কোথায়!

রক্তরঙা সিঁদুর বুকে সিংদরজার স্বস্তিকা!

গান-গল্পের জলসাঘরের আলবোলার ঐ নীল ধোঁয়ায়

পূর্ণ হ'ত তখন প্রাসাদ; শারদীয়া প্রশস্তিকা।

জাত-পাতের ঝিল পেরিয়ে সুর ছড়াতো সাঁঝ সকাল—

রক্ষিতাদের ভিটের মাটির স্পর্শ ধন্য সেই সেকাল।

এখন বজায় ঠাট ও ঠমক, বাইরে বাবু, ভিত খোঁড়া

কথকতায় কম্বুকণ্ঠ, চাঁদার দয়ায় ভোজবাজি

শত্রুমুখে ছাইটিদিয়ে সটান হল চিৎ ঘোড়া

বরিস বেকার 'ওপেন' করবে। সঙ্গে মিঠুন, আর ষ্টেফি।

ছলাখ টাকার পূজো এবার—লাইট, মাইক, হুম, বাওয়া

রেমো আসছে, হাসান, অমিত—ওয়ে ওয়ে আর হাওয়া হাওয়া।

সুজয় বন্দোপাধ্যায়
এক্রোস্টিক

চার মোহনার বুড়ি ছুঁয়ে

কনকলতা দেবী

অজুহাত : নাতিরা এসে ধরলে—'ঠাকুমা, এই একশ বছরের পুজোয় আমরা একটা স্মারক সংখ্যা ছাপাবো। তোমাকে একটা লেখা দিতে হবে।' আমি বললুম—ওরে, আমার বিদ্যে তো জানিস পাঁচ ক্লাস অবধি, তার উপর তোদের ঠাকুরদা সেই কবে, মাত্র দোদ্দ বছর বয়সে আমাকে এ বাড়ীতে এনেছেন। আমি লেখালেখির কি জানি ভাই! ওরা বললে—'তা জানিনা, লিখতে তোমাকে হবেই। এতগুলো বছর ধরে পুজোটাকে দেখছ, ঘোগাড়-যন্ত্র করছ, তোমার অভিজ্ঞতার দামটাই আলাদা।' আমি হাসলুম—শুধু অভিজ্ঞতার দাম থাকলেই হ'ল! ভাষার দাম নেই! আমি কি লিখতে কি লিখব, আর যারা পড়বে, তারা হাসির ফোয়ারা ছোটাবে। ওরাও নাছোড়-বান্দা—'কেউ হাসবে না, কেউ দোষ দেবে না। তুমি যা দেখেছ, যেমনটি দেখেছ—তেমন করেই লিখে দাও।' অগত্যা মধুসূদন। কিন্তু আমি লেখিকা নই, সাদামাটা করে অগোছালো অবস্থায় একটা কিছু বলার চেষ্টা করছি মাত্র—শুধু নাতিদের পাল্লায় পড়ে।

বয়স ৮২। সেই কবে কোন যুগে লাল চেলী পরে ৮নং পটুয়াটোলা লেনের এই গিজগিজে ব্যানার্জী বাড়ীতে প্রবেশ, তারপর থেকে একে একে চারটে প্রজন্ম পার হয়েছে। নয় নয় করেও প্রায় ৭০টি অকাল বোধনের কায়িক ও মানসিক অংশীদার। বয়স অনেক কিছুই কেড়েছে, কাড়তে পারেনি একক ও সম্মিলক স্মৃতির ভাণ্ডার। তবু বয়সের জন্যই হোক বা মনভিজ্ঞতায়—মাঝে মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে বিন্যাসের দিক থেকে মার্জনা করবেন, যদি কোন ক্ষেত্রে সেকাল একালের দৃষ্টিসীমার বাইরে থেকে যায়।

মোহনা এক ॥ বর্তমানের যন্ত্রহাসি

এবার ব্যানার্জীদের বাড়ীর দুর্গাপূজোর ১০০তম বছর। ১০০ বছর, মানে শতবার্ষিকী। বোলতার চাকে ঢিল পড়ার গুঞ্জন শুরু হল বাড়ীতে। সাজ, সাজ, সাজ। কেউ কেউ জটলা করছে, কেউ এসে জিজ্ঞেস করছে মতামত। অতি উৎসাহী কেউ আবার নিজেই উদ্যোগ নিয়ে নতুন কিছু করার সংকল্প করল। তো হল। এই দুর্মূল্যের বাজারে বেশ ধুমধামই হ'ল। তেল পুড়ল, রাধাও নাচল—পাঁজা পাঁজা লুচি, নৌকা নৌকা ডাল, তরকারী, চাটনী, মিষ্টি শেষ হ'ল। শেষ হল বোতল বোতল শরবত, ঝুড়ি ঝুড়ি বরফ। আরও অনেক কিছু হ'ল। দিল্লী থেকে মন্ত্রী এলেন উদ্বোধন করতে, ছবি তুললেন সবার সঙ্গে, পুরাতনী ও টপ্পাগানের নামকরা শিল্পী এলেন। সানাই বাজল এমন কি, ঐ যে একটা যন্ত্রের মধ্যেই ১০-১২টা বাজনা বাজে, তাও বাজল। নতুন আরও অনেক হ'ল। ভিডিও তোলা হ'ল চারদিন ধরে—যার কিছুটা আবার দিল্লী থেকে টিভিতে দেখানোও হল একদিন। নাতিরা বললে—'কেমন হয়েছে ঠাকুমা! এ বাড়ির ঐতিহ্যের সিন্দুকে আরও একটা দলিল জমা করে রাখলুম।' আমি ভাবলুম—মনের থেকেও বড় ভিডিও কিছু আছে নাকি! মুখে বললুম—'বাঃ। বেশ হয়েছে।' বলে হাসলুম। সে হাসি ঐ ইলেকট্রিকের বাজনাটার মতই যন্ত্রহাসি, হাসছি ঠিকই, কিন্তু প্রাণ নেই। কারণ, আমার মনে হল—সব কিছুই হয়েছে ঠিকঠাক, তবু যেন কিসের একটা ভাব—সেকি যন্ত্রযুগের যান্ত্রিকতার! যার মধ্যে নিয়ম আছে, শৃঙ্খলা আছে, নেই আবেগদীপ্ত উচ্ছলতা.....

মোহনা দুই ॥ স্বপনে বাজে গো বাঁশী

চৌদ্দ বছর বয়সে বৌ হিসাবে এ বাড়ীতে আসা ইস্তক দুর্গাপূজার বোলবালাও দেখছি। দুর্গাপূজা মা সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী নয়—এ বাড়ীতে বোধন শুরু হত শুক্লাপ্রতিপদের দিন মানে যে ভোরে মহালয়া। হয় তার দু'দিন আগে অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীতে বোধনের ঘরে মাটি আর ইট দিয়ে বেদী বাঁধা হত। বোধনে সকালে সেই বেদীতে বেলগাছের চারা বসিয়ে ঘট পেতে বোধন শুরু হত। আর সব পারিবারিক পূজার মত এক্ষেত্রে ঠাকুর তৈরী হত পরদিন ঠাকুরদালানে এবং শিল্পীরাও বংশানুক্রমিক ভাবেই ঠাকুর বানাতেন। বোধন থেকেই বাড়ীর বৌ-ঝিদের হিমাসম খাওয়া অবস্থার সূত্রপাত ঘটত। উপকরণ, উপাচার, শাস্ত্রীয় মতে পাঁজির সময় ঠিকঠি মিলিয়ে পুজারম্ভ ও শেষ, ভোগ রান্না, অতিথি আপ্যায়ণ—সব মিলিয়ে এলাহী। ভোগ শুরু হত বোধনের দিন থেকেই যদিও তার আয়োজন থাকত কম। আর পূজোর চারদিন রোজ ১২টা করে বড় বড় মালসায় ভোগ দেওয়া হত তাতে ন রকম ভাজা, মাখন ও গাওয়া ঘি দেওয়া হত। পূজোর আচার অন্যান্য সবাকার মত এক থাকলেও আমার মনে পড়ছে দেবীর কাছে মূল ৪ দিন রোজ ১১টি করে পিতলের থালায় ১ পোয়া করে বাটা চিনি (কাশীর চিনি) নারকেল নাড়ু ৫টি মাটির হাঁড়ি ভর্ত্তি মুড়কি, ত্রিপত্র বেলপাতা এবং ১১টি লালপাড় ধুতি নিবেদন করা হত। পূজো শেষে সেগুলি পাড়ায় বিলি করা হত। ১৯৪৮ সাল অবধি আমাদের বাড়ীতে পাঠাবলিও চালু ছিল। সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী, সন্ধিপূজায় ৪টি করে পাঁঠা বলি দেওয়া হত। সে বছর বলিতে বাঁধা পড়ল, পাঠা এককোপে কাটে না। খুঁত হবার ভয়ে সবার প্রাণ যায় আর কি! পরের বছর থেকে বলিপ্রথা বন্ধ হয়ে গেল।

আয়োজনের আনুষঙ্গিক দিকগুলোরও ঝক্কি ছিল অনেক। আমার মনে আছে, কেনা দই দিয়ে পূজো নৈবেদ্য সাজানো যেত না। আগে কাঁচা তেঁতুল দিয়ে দই পেতে সেই দম্বল দিয়ে উপাচারের দই পাতা হত। মুড়কিও তৈরী হত বাড়ীতে। ধান এনে, ভেজে খই করে চালুনি দিয়ে চেলে বড় বড় পিতলের গামলায় গুড় মাখিয়ে মুড়কি তৈরী করা হত। মোটা কাঠির মাদুর দুটোকে একসাথে জুড়ে সেলাই করে বস্তা বানানো হত—সেই মাদুরের বস্তায় রাখা হত মুড়কি। খয়ের এবং ধূপও কেনা চলত না। শ্রাবণমাসে কেয়া ফুল কিনে রেখে দেওয়া হত ঠাকুরঘরে। পরে সুপারী, মৌরী, ধনের চাল, ছোট-বড় এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি ইত্যাদি মশলা কুটে সেগুলি এবং কেয়াফুলের রেণু একসাথে মিশিয়ে কচি কেয়াপাতায় মুড়ে সুতো দিয়ে বেঁধে রোদ্দুরে শুকিয়ে নেওয়া হতো। অবশ্য জনকপুরী খয়ের গঙ্গাজলে ভিজিয়েও ব্যবহার করা হত। ধূপের ক্ষেত্রেও বড়বাজার থেকে ধূপের সুগন্ধী মশলা এনে গঙ্গাজলে ভিজিয়ে, বেটে, হাতে করে পাকিয়ে ধূপ বানানো হত।

এতসব কাজ, তবু কিন্তু কোনটাই শ্রমসাধ্য লাগত না। বরং ভালোই লাগত। অবশ্য আমরা ছিলাম অনেকগুলি বৌঝি। সবাই মিলে দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছিলুম। এবং নিষ্ঠাও ছিল প্রত্যেকের। এখনও আমার গা শিউরে ওঠে—যখন দেবীপক্ষের শুরুতে খুব ভোরে বেজে ওঠে শাঁখ; আর সুললিত কণ্ঠ থেকে ভেসে আসে সেই গান—বাজলো তোমার আলোর বেণু···এইতো. আর একটা দিন পরেই বোধন বসার যোগাড়যন্ত্র শুরু হবে··· শাশুড়ী ঠাকরুণ বা অন্য কেউ এসে ডাকবেন···সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে হবে···স্নান শেষ করে, গরদের শাড়ী পরে, ভেজা চুলে ডগায় একটা গিঁট দিয়ে দাঁড়াবো শাঁখ হাতে···ওইতো, ঠাকুরমশাই আসছেন···

পরক্ষণেই বুঝি, না, সে সময় চলে গেছে। তবু এখনও, প্রতিমার চোখ মোছানোর তুলো শিশিরে ভেজাতে গিয়ে ছাদে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ হঠাৎই বাঁশী বেজে ওঠে স্বপনে---নাকি জাগরণেই!

মোহনা তিন ॥ জগতে আনন্দযজ্ঞে

এখনকার ছেলে ছোকরাদের দেখি, ওরা আমোদ বলতে জানে পটকার ধুন্দুমার শব্দ, আলোর কেরদানী আর দেশীবিদেশী কায়দা কেতার জগঝম্পকে। তখনকার কর্তারাও পায়রা ওড়াতেন, বাজী পোড়াতেন। তবে আমাদের বাড়ীর কর্তারা পূজোর সময় আনন্দ বলতে জানতেন শয়ে শয়ে লোক খাওয়াতে আর কালোয়াতী গানের দরবার বসাতে। খাওয়া মানে খাওয়া—সে খাওয়া এখনকার বিয়েবাড়ীর ভোজকেও লজ্জা দেবে। আমার বেশ মনে আছে, বোধনের দিন অর্থাৎ শুক্লা প্রতিপদের দিন থেকেই লোক খাওয়ানো শুরু হত। ঐ দিন থেকে পঞ্চমী পর্যন্ত প্রতিদিন খাওয়াদাওয়ার পাট চুকতো বিকেল ৫টা-সাড়ে ৫টায়। যদিও এই খাওয়াটা সাধারণ পর্যায়ের অর্থাৎ ঘরোয়া ডাল-ভাত-তরকারী-মাছ-চাটনী অথবা খিচুড়ি-তরকারী-মাছ চাটনী ইত্যাদি। দই-মিষ্টিও থাকত তবে কম কম। দই-মিষ্টির বিপুল আয়োজন হত পূজোর চারদিন রাত্রে। পড়শীরা খেতেন, আত্মীয় কুটুম্বরাও খেতেন। রাত্রে কোন আমিষ থাকত না। থাকত লুচি, ডাল, নানাবিধ তরকারী, চাটনী এবং প্রচুর পরিমাণে মিষ্টি ও দই। আমি অনেকবারই প্রায় ১৬ ১৭ রকমের মিষ্টি হতে দেখেছি। রাত্রের নিমন্ত্রিতের সংখ্যাও এমন বিপুল হত যে রোজই যখন খাওয়া দাওয়া শেষ হত, তখন রাস্তায় করপোরেশনের ময়লাফেলা গাড়ীগুলি নেমে গেছে এবং হোস পাইপ দিয়ে রাস্তা ধোওয়া হচ্ছে।

দিনের বেলাতেই মাছ মাংস হত। আগেই বলেছি সপ্তমী থেকে নবমী প্রতিদিন পূজোয় ৪টি করে পাঁঠা বলি হত। আর তার পরের দিনগুলিতে অবশ্যই সেই মাংসের ভূরিভোজ লেগে যেত। তবে, এই আড়ম্বর আস্তে আস্তে কমতে থাকে। কারন হয়তো জিনিসপত্রের দাম। কি জানি। কিন্তু গান শুনিয়ে লোককে আনন্দ দেবার আড়ম্বর এখনও কমেনি। সে এক পরিবেশ ছিল। আতর ছড়িয়ে, ফুল সাজিয়ে, ধূপ জালিয়ে জলসাঘরে এক শুচিশুভ্র মেজাজ আনা হত। সেখানে ফরাসের উপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসা বাড়ীর এবং পড়শী, আত্মীয় পুরুষরা, চিকের আড়ালে মেয়েরা আর পানের বাটা-পিকদানী-যন্ত্রীসংঘ পরিবৃত গাইয়ে বাজিয়ে ওস্তাদরা। কত শিল্পী আসতেন। রাইচাঁদ বড়াল, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, শচীনদাস মতিলাল, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, শৈলেশ চক্রবর্তী শৈলেশ দত্তগুপ্ত, সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন মুখোপাধ্যায়, বাদল খাঁ, পাখোয়াজী নগেন দত্ত, তবলিয়া আহম্মদজান থেরাকুয়া ও বাচ্চি খাঁ, হারমোনিয়াম বাদক মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায় (এ বাড়ীর ছেলে)—এমনি আরও কতজন। শিল্পীদের এ বাড়ীতে বরাবরই অবারিত দ্বার। রাত ভোর হয়ে যেত সে সব শুনতে শুনতে···মনেই থাকত না সকালে অনেক কাজ, আয়োজন···শুধু অতৃপ্ত শ্রবণ জুড়ে জেগে থাকত দরবারী, তিলোককামোদ, টোড়ি, ইমন, মারুবেহাগ, ললিত, কলাবতী, হংসধ্বনি, দুর্গা...শুনতে শুনতে এ বাড়ীর পরিসীমা ছাড়িয়ে চলে যেতুম সুদূরে···নিজেকে মনে হত এক হংসী, নীল একটা ঈশ্বরদত্ত চিঠি নিয়ে উড়ছি আর আপন মনে গাইছি—জগতে আনন্দযজ্ঞে, সবার নিমন্ত্রণ হে···

মোহনা চার ॥ পুনরাগমনায়চ

সেই পূজো চলছে। একশ বছর চলছে। আরও কয়েক একশ বছর চলুক—এই প্রার্থনা করি। সেদিন হবে আরও আনন্দের দিন। আমি থাকব না কিন্তু আর সবাই মানে নতুন নতুন প্রজন্ম থাকবে। তারা পূজো করবে, আনন্দ করবে। তাদের চোখ দিয়েও কি দেখতে পাবো না! নজরুল কবি বলেছেন—মৃত্যু জীবনের শেষ নহে, নহে। তার মানে তো মৃত্যুতে নতুন জন্মের সূচনা। তাহলে লোভ কেন, চাক্ষুষ দেখার। আসলে আমিও তো মানুষ। আর মানুষ মাত্রেই লোভী। মরতে মরতেও বাঁচার লোভ। সে কারণেই, অস্বীকার করি না, মাঝে মাঝে মনে হয়—

চার মোহনার বুড়ি ছুঁয়ে
পেরিয়ে এলাম একশ নদী—
আবহমান কালের মতই
জীবন আমার বইত যদি···

এ শুধু ধৃষ্টতা নয়—অপরাধ। যদিও এমনটি সম্ভব নয়। অমরত্ব অবশ্য কেউ কেউ পায়, তার সুকৃতির জোরে। আমার আছে কি! আমি তো তেমন ক্ষমতাধারিণী নই যে যমকে ফিরিয়ে দেব বারবার! আমার তেমন অধিকারও নেই যে প্রশ্ন তুলবো : যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো?

বরং আমি আশা করতে পারি। এই পৃথিবীতে পুনরাবৃত্তি আছে। সূর্য অস্ত যায় আবার ওঠে। বিসর্জনের ঢাকের তালে দেবী গঙ্গায় পড়ে যান ঝুপ করে—আবার বছর ঘুরতেই বোধন। এইত উপায়। যে মাটির টানে যিশু, বুদ্ধদেব, মহম্মদ সবাই বারংবার পুনরুত্থিত হয়েছেন, বিষ্ণু বারবার অবতার হয়ে নেমেছেন, সেই মাটি আমাকেই বা সহজে চিরতরে বিদায় দেবে কেন? বরং যাবার বেলায় চেতনার অতলে তলিয়ে গিয়ে শ্রুতিতে ধরা পড়বে না কি মধুর এক ডাক—আবার আসিদ্, পুনরাগমনায় চ॥—

কনকলতা
১লা কার্ত্তিক ১৩৯৬

॥ কি রাঁধন রেঁধেছ ॥

শ্রীমতি শান্তিলতা দেবী

আমাদের গ্রামের নাম গাঙাটীয়া। পূর্ববঙ্গের মনময়সিং জেলার অন্তর্গত। কথিত আছে সেই নবাবী আমলে সিরাজদৌলার রাজত্বে সমসাময়িক ঘটনা। গ্রামের ছোট্ট মেয়ে গঙ্গা ছিল রূপে লক্ষী গুনে সরস্বতী, পিতা ছিলেন বিদগ্ধ পণ্ডিত। কোনো কারণে নবাবের কাছে খবর গেল কিশোরী গঙ্গার রূপের কথা। গ্রামের সকলে বিশেষকরে পণ্ডিতমশাই সঙ্কিত হয়ে উঠলেন মেয়ের কারণে। বুঝি এই পেয়াদা বরকন্দাজ এলো গঙ্গাকে নিয়ে যেতে। অগত্যা সকলে মিলে যথাশিঘ্র গঙ্গাকে পাত্রস্থ করে রাতারাতি উত্তর বাংলায় পাঠিয়ে দিলেন। তারপর থেকে গঙ্গার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। গঙ্গারই সূত্র ধরে গ্রামের নাম হল গাঙাটীয়া।

দুর্গাপূজার সানিধ্য আমার জন্মসূত্র থেকেই, অর্থাৎ বাপের বাড়ির থেকে। সে ছিল মেটে বাংলার গ্রামীন দুর্গাপুজা। মোটামুটি পূজার আচার অনুষ্ঠান ছিল প্রায় একই রকম তবে আমাদের বাড়িতে পূজার চার দিনই বলি হতো মোষ। আমার ঠাকুরদাদা প্রথম কলকাতায় আইন পড়তে আসেন। তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম চার জন স্বীকৃত পাঠকদের মধ্যে একজন, শ্রীযুক্ত ৺দ্বারিকানাথ চক্রবর্তী। পরবর্তী কালে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে বপ্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন।

গ্রামের পুজা এখন আমার কাছে আবছা স্মৃতির মতো। সময়ের কালচক্রে ভাগ্যের লিখনে প্রধান বিচাপতির সূত্রের সঙ্গে প্রথম এটনির সুতো বাঁধা পড়লো আমার লাল জোড়ের।

দেখতে দেখতে আমার শ্বশুর বাড়ীর পারিবারিক পূজো একশো বছরে উপনীত হল। দেখতে দেখতে মানে এই একশ বছর ধরে আমি পূজো দেখছি না তবে বিয়ে হয়ে এক বনেদী পরিবার থেকে অন্য বনেদী পরিবারে এসে অবধি এর জাঁকজমক দেখে আসছি। ৫৮ বছর ধরে এ উৎসবের সঙ্গে আমি জড়িত। তাই, এই শেষবেলায় শতবর্ষপুর্তি দেখে আমি তৃপ্ত। আরও তৃপ্ত একারণে যে, এ বাড়ীর প্রথম দিকের পুজোর সম্বন্ধে শাশুড়ী ঠাকরুণের কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শুনেছি। আর এ বছর তার শতবর্ষ দেখলাম। আমার নাতিপুতিদের ভাষায় বলতে হলে—গাভাসকার-এর প্রথম রাণটা দেখিনি কারণ মাঠে ঢুকে সিট পেয়ে গুছিয়ে বসতে পাঁচ মিনিট, কিন্তু সেঞ্চুরীটা দেখলাম তো! অথবা তুলনীয়, সিনেমার শুরু ও শেষ। আমাকে এই পূজো সম্পর্কে লিখতে বলা হয়েছে। মুশকিল হল, দুর্গা পুজার ধরণধারণ বাঙলার সর্বত্রই এক যদিও ক্ষেত্রবিশেষে আচারগত কিছু পার্থক্য থাকতে পারে। এখন এই সমস্ত পার্থক্য সম্বন্ধে বলার মতো ক্ষমতা আমার নেই, তাছাড়া অনেক কথাই ভুলে গেছি—স্বভাবে নয় অভাবে। মানে যুগ বদলেছে সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে অনেক কিছু। সেরকম কোন কোন বিষয় হয়ত আমাদের আগের কাল থেকে একালে পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। তাই, ওসব কচকচি ছেড়ে সাধারণ দু একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি— যা এক কথায় পূজো সম্বন্ধীয় খুচরো খবর বলে চালানো যেতে পারে।

এ বাড়ীতে আগে পূজোর সময় বলি হতো—পাঠাবলি। সালটা ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হবে। বাধা পড়ল বলিতে। ব্যাস! সকলের চোখ মুখের এমন এক ছবি যে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে সন্দিগ্ধ নজরে দেখছে খুঁতের জন্য। আমরা সকলে ভয়ে অস্থির। যাহোক বাবুরা তাড়াতাড়ি অন্য পাঠা আনিয়ে অবস্থা সামাল দিলেন। কিন্তু সেবছরই বাড়ির একজনের অকাল প্রয়াণে আবার সেই সন্দেহ, সংস্কার এবং ভয় ফিরে এলো। কর্তারা হুকুম দিলেন, পণ্ডিতরা পরামর্শ দিলেন—পরের বছর থেকে বলি বন্ধ হল। ভাল কি মন্দ হল জানিনা, ঘটনা দুটোর মধ্যে কোন

সংযোগিকতা বর্তমান আছে কিনা জানা নেই—শুধু বলতে পারি, সেই একটি বছর অত্যন্ত শঙ্কা, উদ্বেগ এবং অবিশ্বাসে ভরা ছিল। এই শঙ্কা, উদ্বেগ কিংবা এর থেকেও বেশি, দেখেছিলাম ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়। সেসময় শুধু বলি নয়—পূজোই বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। অনেক বাড়ীর দরজাতেই পুজোর সময় কাটা গরুর মাথা ফেলে যেত মুসলিমরা—যদিও সত্যিই তারা ধর্মভীরু ইসলামী কিনা জানি না। আমাদের বাড়ীতে অবশ্য এ অত্যাচার কখনও হয়নি—কারণ হিন্দু ব্যাতিরেকে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষেরা পূজোর সময় আসতেন আমাদের বাড়ীতে। তার উপর নামকরা পণ্ডিত, সমাজ সংস্কারক, গায়ক, বাদক, শিল্পীদের সমাগম হত—তা তিনি যে ধর্মভুক্তই হোন। তো কোন অত্যাচার না হলেও আমরা ছিলাম ভয়ে কাঁটা—কি জানি সব মানুষতো সমান হয় না। শেষমেশ অবশ্য ব্যাপারটা বেশীদূর গড়ায় নি। তৎকালীন সরকার, পুলিশ এবং গান্ধীজি এবং বিদগ্ধ জনের প্রভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পূজোয় আরও একবার সংকট হয়েছিল যখন কোলকাতায় বোমা পড়ে। আমরা সকলেই বিষ্ণুপুর চলে গিয়েছিলাম। এটাও ঘটেনি কারণ মা বোধহয় চাননি তাঁর পূজো বন্ধ হোক। সেই পূজো চলতে চলতে একশ বছরে এল। ভাবতে ভারী ভাল লাগছে আগামী একশ বছর শেষেও হয়ত কেউ আমার মত লিখবে—তাতে পুরনো দলিলের সঙ্গে নতুন তথ্য যুক্ত হবে।

অভিজ্ঞতার যদিও শেষ নেই—বিশেষ করে এই বনেদী বাড়ীর ইট কাঠের ফাঁক ফোকরে কত কথাই যে জমা হয়ে আছে। সব কথা ওগরাতে গেলে মহাভারত না হোক মোটাসোটা একটা পুঁথি অবশ্যই হবে। আমি শুধু দুটো ঘটনার কথা বলে শেষ করব। ঘটনাদুটি মজার না বিদ্রুপের তা আপনারা বিচার করবেন।

পুজোর সময় আমাদের বাড়ীতে অনেক লোকের (আত্মীয় কুটুম্ব ও বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত জন) সমাগম হত আগেই বলেছি। জমত খাওয়া দাওয়া—জমত গান বাজনার আসর। অতিথি পরায়ন বলে এ বাড়ির সুনাম ছিল। যে সব শিল্পীরা মার্গ সঙ্গীতের আসর বসাতেন তাঁরা সবাই এ বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া সারতেন। তারপর বসত জলসা—কখনো কখনো রাত ফুরনো। সেরকমই একবার, কোলকাতার এক নামী ওস্তাদ এসেছেন সেবার। ঠাট্টা তামাসা হল, একথা সেকথা হল। ওস্তাদ সঙ্গীসাথী সহ ভূরিভোজ সারলেন। শেষ করার পর পান মুখে বসে কর্তাদের সঙ্গে গল্পগুজব শুরু করলেন। তবলাচি, সারঙ্গীবাদকরা যন্ত্রপাতি সাজাতে বসেছেন এমন সময় ওস্তাদজী বললেন তিনি গাইবেন না। চিকের আড়ালে আমরা তটস্থ, বাবুরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন, প্রতিবেশী শ্রোতারা কানাকানি করছেন, বাবুরা অনুরোধ করলেন কয়েকবার কিন্তু শিল্পীর একই কথা—তাঁর গলা খারাপ লাগছে, সুতরাং খারাপ গলায় গান শুনিয়ে নাম খারাপ করতে রাজী নন। বাবুরা হাল ছেড়ে দিলেন, পড়শীরা উঠি উঠি করতে লাগলেন, আমরা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে, এমন সময় আমাদের বাড়ীরই ছোট্ট একটি মেয়ে, সাত কি আট বছর বয়স, তার সারল্য নিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করল শিল্পীকে—ওস্তাদজী, আপনি গাইবেন না তো খেলেন কেন? সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকলের বুক দুরদুর—কি জানি ওস্তাদ যদি অপমানিত বোধ করেন। মেয়েটি কে ওখান থেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করতে ওস্তাদজী বাধা দিলেন ও একগাল হেসে বললেন—ঠিক বলেছিস মা, আমার মাথায় কথাটা আসেনি—এত খেয়েও যদি গলার কিছু না হয় তাহলে কয়েকটা গান গাইলেও হবে না ……কই হে, বাঁধো তবলা। আমরা সকলেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম আর গলা খারাপ হওয়া সত্ত্বেও সে বছর প্রাণমাতানো আসর জমিয়ে দিলেন সেই ওস্তাদ। দ্বিতীয় ঘটনাটিকে সাহিত্যিকের ভাষায় কি বলে জানি না কিন্তু এটির মধ্যে আমি অন্তত বর্তমান দিনের প্রতিচ্ছবি, দেখতে পাই—সমাজ, সংসার, রাজনীতি, শিল্পী—সর্বস্তরেই। আমাদের এক আত্মীয়া ছিলেন এবাড়ীতে। মিশুকে, সদাহাসিমুখ, মজার মজার কথা বলে সকলকে মাতিয়ে রাখতেন। পূজোর কদিন রান্নার হেঁসেলে এসে যেই থাকুক আর যাই রাঁধুক না কেন মুখটি বাড়িয়ে গাইতেন—"কি রাঁধন রেঁধেছ দিদি—চচ্চড়ি!" ওই একটিই লাইন প্রত্যেকবার ঘুরে ফিরে। তখন আমরা হাসতাম, তাঁকে উৎসাহিত করতাম, এখন এই পরিণত বয়সে বুঝি সত্যিই আমরা চিরটাকাল শুধু চচ্চড়িই রেঁধে এসেছি এবং এখনও আসছি। অন্য কিছু রাঁধতে চাইলেও সেই রান্না হয়ে যাচ্ছে ওই—চচ্চড়ি।

শান্তিলতা ৬ই কার্ত্তিক ১৩৯৬

শতবর্ষ পরে

প্রবাল মুখোপাধ্যায়

এইমাত্র 'কম্পুটার ক্লক'টা সুরেলা আওয়াজে জানিয়ে দিল যে এখন ঠিক কাঁটায় কাঁটায় নয়, ডিজিটে ডিজিটে ন'টা বাজে। আজ দিনটা সপ্তমী। ইং একবিংশ উননব্বই খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের সাত তারিখ। আজকের দিনটা আমার যে অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে কাটবে তা আমি সকালেই বুঝেছি। কারণটা বলছি পরে। আজ দুর্গাপুজার প্রথম দিন। বাড়িতে লোকে লোকারণ্য, শুধু যে লোকের ভিড় তাই নয়, অনেকে আবার সঙ্গে করে 'P.R' এনেছে। 'P.R' মানে বুঝলেন না? ও হোঃ 'P.R' মানে 'Personal Robot' অর্থাৎ 'ব্যক্তিগত যন্ত্রমানব'। আগে যেমন লোকে 'P.A' নিয়ে ঘুরত এখন তেমনি 'P.R' নিয়ে ঘোরার চল হয়েছে।

বাড়িতে পুজো, তাই কাজের চাপ একটু বেশী। এখন যে আমাদের বাড়ির 'Big Boss মানে যাকে আগেকার দিনে 'বড় কর্তা বলা হত সেই মুনমুনদা গত মাসে ব্যবসায়িক কাজে 'মঙ্গল' গ্রহে গেছে। আরে, চমকে গেলেন নাকি? এখন ত লোকে হামেশাই গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাচ্ছে। শুনেছি আমাদের এই পটুয়াটোলার বাড়ির এক মেয়ে, কি যেন তার নাম, ও হ্যাঁ। পুঁটি, হ্যাঁ। হ্যাঁ পুঁটি সেই ত America-য় ছিল যেবার এ বাড়ির পূজা শতবর্ষে পদার্পণ করেছিল। বুঝতেই পারছেন, বাড়ির লোক বাইরে থাকলে কি রকম কাজের চাপ বাড়ে।

ঘরের দরজার ওপরে লাগানো 'স্ক্রীনে' দেখলাম চিকু ঘরে ঢুকবে বলে দরজা ঠেলছে। এই ধরনের দরজা হওয়ার পর কি সুবিধে হয়েছে তা কি বলব। অকারণে খটখট করতে হয় না ঘরে ঢুকেই চিকু বলল "প্রবালদা, কাগজে খবরটা দেখেছ?" আমার ভ্যাবাচাকা মুখ দেখে ও নিজেই বললো "ভারত যে স্যাটেলাইট Plutoতে পাঠিয়েছিল, সেটা প্লুটো থেকে নানা রকম ছবি পাঠিয়েছে এবং কাগজে আরও লিখেছে...মাঝপথে ওকে থামিয়ে আমি বললাম "আরে, ওসব বাদ দে, মিষ্টিগুলো এসেছে, পূজোর মন্ত্র ক্লিপিগুলোর কি হল? "চিকু উত্তর দিল, শুন্যে ভাসতে ভাসতে "ওসব চিন্তা কোর না, আমি সব দেখছি।" এবারে পুজোয় বেরিয়েছে এক ধরনের যান্ত্রিক জামা যার নাম "হাওয়া জামা" যেটা পরলে Deleted শুন্যে ভেসে থাকা যায়। অনেকের দেখাদেখি চিকুও সেই 'হাওয়া জামা' কিনেছে ভেসে ভেসে ঠাকুর দেখবে বলে।

হঠাৎ টেলিফোনটা বিপ বিপ করে বেজে উঠল। রিসিভার তুলে নিয়ে কানে ধরলাম। প্রবাল: হ্যালো, কে? আরে কি খবর ভাল তো? কবে আসছ?

মুনদা: আমি ভালই আছি কিন্তু যেতে পারছি না এবারে ভীষণ ব্যস্ত। তা পূজো কেমন হচ্ছে বল?

প্রবাল: হ্যাঁ পূজো ঠিকই হচ্ছে. অনেকে বলেছিল পুরোহিত আনতে, আমরা আর সেই ঝামেলা করি নি। কম্পুটার আর রোবট দিয়েই কাজ চালিয়ে নেব। সংস্কৃত ভাষা ত লুপ্ত তাই কে এখন সংস্কৃত'র শ্লোক পড়বে।

মুনদা: কম্পুটার পূজা মানে?

প্রবাল: সেদিন খুঁজতে খুঁজতে বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলের 'দুর্গাপূজা নির্দেশিকা' নামে এক সংস্কৃত মন্ত্রপাঠের বই খুঁজে পেলাম, বই না বলে পুঁথি বলাই শ্রেয়। সেটা নিয়ে ভাষাতত্ত্ববিদ ব্রজগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি গেলাম। উনি ঐ বই থেকে পূজার ধারা অনুযায়ী মন্ত্রপাঠ করে গেলেন ও আমরা সেটাকে কম্পুটারে তুলে নিলাম। পরে পুরোহিতের বদলে একটা Robot কিনে ভাল করে শুদ্ধ করে, কম্পুটারের সাথে Robotটা তুলে দিলাম। পরীক্ষামূলকভাবে চালিয়ে দেখি এক অভিনব ব্যাপার।

মুনদা: ত বেশ করেছিস? প্রতিমাটা কেমন করেছে?

প্রবাল : মাটিরই মূর্তি, কিছুটা অন্যরকম, ঠাকুরের গয়নাগুলো সব 3-Dimensional লাইট এনার্জিতে তৈরি।

মুনদা : বাঃ খাসাপ্ল্যান করেছিস ত? তা, কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিস নাকি?

প্রবাল : হ্যাঁ, খুব একটা করা যায় নি, তুমি নেই বলে, তবে একটা 3-Demensional লেসার প্রদর্শণীর ব্যবস্থা করেছি।

মুনদা : তা লোক খাওয়ানোর ব্যবস্থা কি রকম করেছিস?

প্রবাল : লোক খাওয়ানোটা কোন চিন্তাই নয়। এবারে লোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাবে। বিভিন্ন কাউন্টারের ব্যবস্থা থাকবে। নানা রকম খাবার পাওয়া যাবে। 'Robot'রা পরিবেশন করবে। যে যেটা ইচ্ছা যত খুশী খাবে। কেমন, ঠিক আছে ত? শুধু Remote Control মেনুর বোতাম স্পর্শের অপেক্ষা।

মুনদা : বাঃ বাঃ খুব ভাল, তুই ত দেখছি কাজের ছেলে হয়ে গেলি? এত সব কাজে কোন অসুবিধে হচ্ছে না ত।

প্রবাল : না, না, অসুবিধে হবে কেন? বাচ্চিদা, শোভন, কোকো রুপুন, চিকু, বুড়ো সবাই সহযোগিতা করছে।

মুনদা : আচ্ছা একটা কথা, বিসর্জনটা এবারে কোথায় হবে? গঙ্গায় না কি কোন মহাসাগরে? দেখ আমার মত নিলে কিন্তু আমি বলব প্রশান্ত মহাসাগরের কথা।

প্রবাল : হাঃ হাঃ হাঃ মুনমুনদা পিছিয়ে পড়েছ অনেক পিছিয়ে পড়েছ। এবারে জলে বিসর্জন দেওয়ার কোন প্রশ্নই নেই। এবারে বিসর্জন দেব 'মহাকাশে'। হ্যাঁ অন্তরীক্ষে, কারন ঠাকুরদাদার মুখে শুনেছি দেবতাদের স্বর্গেই বাস। স্বর্গ বলতে মাথার ওপর। মাথার ওপর বলতে আকাশ। আকাশের ওপর বলতে নিশ্চয় মহাকাশ।

মুনদা : ওঃ, পূজোটা সত্যিই miss করলাম।

প্রবাল : না, না, দুঃখ কর না। পুরো ঘটনাই Lacer Beam এ রেকর্ড কর্য থাকবে। ফিরে এলেই দেখতে পাবে।

মুনদা : তা জানিস ত, সব ভাল তার, শেষ ভাল যার। স্যুভেনিরটা কেমন হবে?

প্রবাল : এবারে বুঝলে কাগজে আর ছাপবই না, 'Computer soft waryfloppy তে প্রিন্ট করে অতিথিদের বাড়ি বাড়ি সেই ডিস্ক পাঠিয়ে দেব। ব্যস। ব্যাপারটায় নতুনত্ব আছে কি বল?

মুনদা : শোন, বেশ ভাল লাগল পুজো সম্বন্ধে শুনে। রাখছি তাহলে, ও দাঁড়া, দাঁড়া আর একটা কথা, এক মিনিট।

প্রবাল : বল, বল কি ব্যাপার?

মুনদা : বিজয়া সম্মিলনীতে তুই গাইছিস তো?

প্রবাল : কি যে বল? হাসালে, এখন যন্ত্রের যুগ, মানুষের গান কি কেউ শোনে। সবাই সেই কলের গান শোনে।

প্রবাল
৫ই অক্টোবর ২০৭৯

শতবর্ষের আলোক বর্তিনী

মীরা রায়

মাগো আলোক লগনে অকাল বোধনে হে মহামাতৃকাদেবী, সুপ্ত চিত্তে তোমার ঐশী শক্তির উন্মেষে জীবমানস পরম প্রাপ্তিতে পূর্ণতার পরিণামে মহিমময় হয়ে উঠুক, শতবর্ষের তোমার পূজার বেদী মূলে এই আমাদের পূজার মন্ত্র! জ্যোতিরূপা পরমা প্রকৃতি অনাদিকালের তামস সমুদ্রের পূর্বাচলে অরুণোদয়ে আবির্ভূতা হয়ে শতবর্ষের পথচারিণী—শত বর্ষ থেকে সহস্র বৎসরের পরিক্রমায় ভাস্বর থেকে ভাস্বরতর হয়ে থাক তোমার অমৃত-রূপিণী মাতৃমূর্ত্তি।

"অবিদ্যানামন্ত স্তিমিরসিহিরোদ্দী পনকরী,
জড়ানাং চৈতন্যস্তবকমকরন্দ শ্রুতিশিরা।
দরিদ্রাণাং চিন্তামণিগুণনিকা জন্মজলধৌ
নিমগ্নানাং দংষ্ট্রা মুরিপুবরাহস্য ভবতী॥"

মা, অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন চিত্তের অহম রূপ অন্ধকার দূর করবার জন্য জ্ঞানরূপ আলোকের অবতারণা কর, সংসার সাগরনিমগ্ন মানুষের উদ্ধারের জন্য তুমি বরাহরূপী বিষ্ণুর দ্রংষ্ট্রাস্বরূপা—বিষয়নিমজ্জিত মানুষের তুমি মুক্তিদাত্রী—তুমি আমাদের শতবর্ষের সীমা বন্ধনে অসীমা, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ ত্রয়ী কালের আবর্তে তুমি শাশ্বতী

"তনীয়াংসং পাংশুং তবচরণে পদ্মোরুহভবং
বিরিঞ্চি সঞ্চিন্বন বিরচয়তি লোকানবিকলম্,।
বহত্যেনং শৌরী : কথমপি সহস্রেন শিরসাং
হরঃ সংক্ষুভ্যৈনং ভজতি ভসিতোদ্ধূলনবিধুম॥"

ভগবন পিতামহ ব্রহ্মা সৃষ্টির আদিপুরুষ তোমার পদরেণু থেকে এই চরাচর সৃষ্টি করেছেন। বিষ্ণু সহস্র মস্তকে সেই সৃষ্টি ধারণ করে রক্ষা করে চলেছেন। প্রলয়কালে ভূতভাবন রুদ্রদেব স্বীয়তেজবলে সৃষ্টি ধ্বংস করে দগ্ধ করে সেই ভস্ম নিজঅঙ্গে বিভূতিরূপে লেপন করে থাকেন এই সৃষ্টি স্থিতিলয়ের প্রযোজিকা তুমি, তুমি সৃষ্টিরূপে ব্রহ্মাণী গায়ত্রীমন্ত্রের উষাকাল তেজোবলে তুমি অগ্নিবর্ণা, সৃষ্টিরক্ষায় তুমি বৈষ্ণবী মায়াময়ী কর্মের মায়া প্রপঞ্চে তুমি রাজসিকা, সৃষ্টির লিলুপ্তিতে তুমি মহাঘোরা মহাকালসঙ্গিনী মহাকালী তামসীবর্ণা।—

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো ভবতি শক্তো প্রভাবতুং,
নচেদেবং দেবোন খলু কুশলং স্পন্দিতুমপি,
অতস্ত্বামারাধ্যাং হরিহরবিরিঞ্চাদিতিরপি,
প্রণন্তু স্তোতুং বা কথমকৃতপুণ্যঃ প্রভবতি॥

যখন স্বয়ং শিব শক্তি সমভিব্যহারেই কেবল মাত্র সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় ইত্যাদি কাজ সক্রিয়ভাবে করতে পারেন এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও অনুরূপভাবে স্বধর্ম পালন করে থাকেন অন্যথায় সৃষ্টি অচল হয়ে যায়, এজন্য ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বর দেবতাগণই তোমার আরাধনা করে থাকেন, তখন আমাদের মত অকৃতপুণ্য সামান্য জীব কিভাবে তোমাকে প্রণাম করব বাস্তব করব?

"মায়ের আমার রূপ দেখে যা, মাঝে আমার কেবল জ্যোতি
মার কৌষিকী রূপ দেখবে চেয়ে
মা যে শুদ্ধা সরস্বতী,
পরম শুদ্ধ জ্যোতি ধারায়, নিখিল বিশ্ব যায় ডুবে যায়, দেখরে পরমাত্মায়
সব জননী সে জ্যোতিষ্মতী, শুদ্ধ শিবে মুগ্ধ করে
চঞ্চলা তুই গেলি সরে
হরের যদি জ্ঞান হরিস মা
মোদের কোথায় গতি ?
আমরা যে তোর অজ্ঞমায়ায় জীব দুর্বল মতি।
ওমা কোথায় মোদের গতি ?

এই কবির ভাষাতেই আমরাও সেই একই আবেদন জানাই এই ত্রিকাল বিধায়িনী জগন্মাতাকে আমরা কিভাবে প্রণতি জানাবো ? মূঢ়বিত্তজীবের গতি কোথায় ? এই ত্রিকাল ব্যাপিনী মহামায়ার কাছে ক্ষুদ্র শতবর্ষের পুষ্পাঞ্জলি কিভাবে জীবাত্মার আত্মাঞ্জলির অনুকর্ষে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে, কিভাবে মাতৃপদে আত্মাঞ্জলির রক্তজবা হৃদয় রুধিরে সজীব ফোটা ফুলটি হয়ে ফুটে থাকবে ? আমাদের হৃদয়ের দ্বারবর্ত্তিনী জননীকে আজ কিভাবে অভ্যর্থনা জানাব ? অনন্য চিন্তায় শুধু এই মাতাঁকে প্রণাম জানাই—

যাদেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ নমো নমঃ ॥"

শতবর্ষের প্রণাম

আনন্দ বন্দোপাধ্যায়

প্রথম বছর পুজো যেবার
শহর যেদিন শিশুই ছিল ;
পা বাড়ালেই কাদামাঠে
গড়ের মাঠেই ধানের আঁটি
দালান গুলো নিচুই ছিল
নয়কো মোটেই বাড়াবাড়ি—
দেবী এলেন পালকী চড়ে
দুলকী চালে—
কিম্বা হয়তো ঘোড়ার গাড়ী।
সেদিনকার সে পুজোর আসর
জাঁক জমক আর আলোর বাজার
হয়তো কিছু মলিন ছিল ;
কিন্তু সেথায় বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ
দেখতে এলেন কত মানুষ
কালের স্রোতে—
আমাদেরই পূর্ব পুরুষ।
বাড়ল শহর পায়ে পায়ে,
রাস্তা সেতু গাড়ীর বহর
পৌঁছে গেল সুদূর গাঁয়ে
চারিদিকে আজ চাঁদের হাট !
নেইকো চিহ্ন বন্যা খরা
মনের খুসী উপচে পড়া
কেবল পূজা—
দশদিকে, মা দশভূজা
এই শহরের গোড়ার কথা
জানতে যাঁরা আজকে কোথা ?
যুগে যুগে এমনি ধারা বইছে হাওয়া
নিত্য-কালের আসা যাওয়া
সভ্যতা তার চারিদিকে তুলছে দেওয়াল
মাথার উপর খোলা আকাশ পুরোন কাল
হাতী ঘোড়া নৌকা ফেলে
এবার বোধ হয়—
আসছে দেবী পাতাল রেলে
শুধরে নিও পঞ্জিকা কার
জীর্ণপাতা,—সময় এবার
ঘুচে সকল দুঃখ অভাব
উৎসবেতে ঘর ভরে যাক
সব মানুষের,
জীবের সেবাই পূজার মন্ত্র
নতুন যুগের।

শরৎকাল

হৈমন্তী মুখোপাধ্যায়

যদি আসিত শরৎকাল,
বলিত সকলে আনন্দের প্রদীপ জ্বাল।
বাজিত শঙ্খ, চারি দীগন্তে—
উঠিত উলুধ্বনি।
যখন হইত রজনী-চারিদিকে জ্বলে উঠিত আলো।
আসিত মা চারিদিক করে মনোরম।
দশ হাতেতে আবির্ভূতা হয়ে দেবী ত্রীশুল হাতে নিয়ে মেটালেন কলঙ্ক,
তোর দর্শনে, স্ফূর্তীতে ভরে সবার চিত্ত—
হে দেবী, হে সাধনা আমার, হে স্বর্গ।
না থাকে চিরকাল এ আনন্দ—
কেটে যাবে মেঘ, আসে নূতন ঋতু !
সবাই মোছে নিজেদের অশ্রু।
বলতে পারিস, কী আনন্দ ওখানে মিলবে তোরে ?
বলতে পারিস মোরে

এক চালের প্রতিমা

ন-গাঁর কালী

1890

বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়

বিনোদ বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

হীরেন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সৌরেন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

Biswaranjan Bandhopadhyay

Mrinalini Debi

Sourendra Mohan Bandhopadhyay

Sanat Kumar Bandhopadhyay

Prabhat Kumar Bandhopadhyay

Subodh Kumar Bandhopadhyay

Sunit Kumar Bandhopadhyay

Sushil Kumar Bandhopadhyay

Gouri Bandhopadhyay

Supriya & Debabrata Mukhopadhyay
Reshmi Mukhopadhyay

Souvik & Atreyee Bandhopadhyay
Aranyak Bandhopadhyay

Sudhir Kumar Bandhopadhyay
Aruna Bandhopadhyay

Soumen Bandhopadhyay & Sarbani Bandhopadhyay
Sohini Bandhopadhyay & Jisha

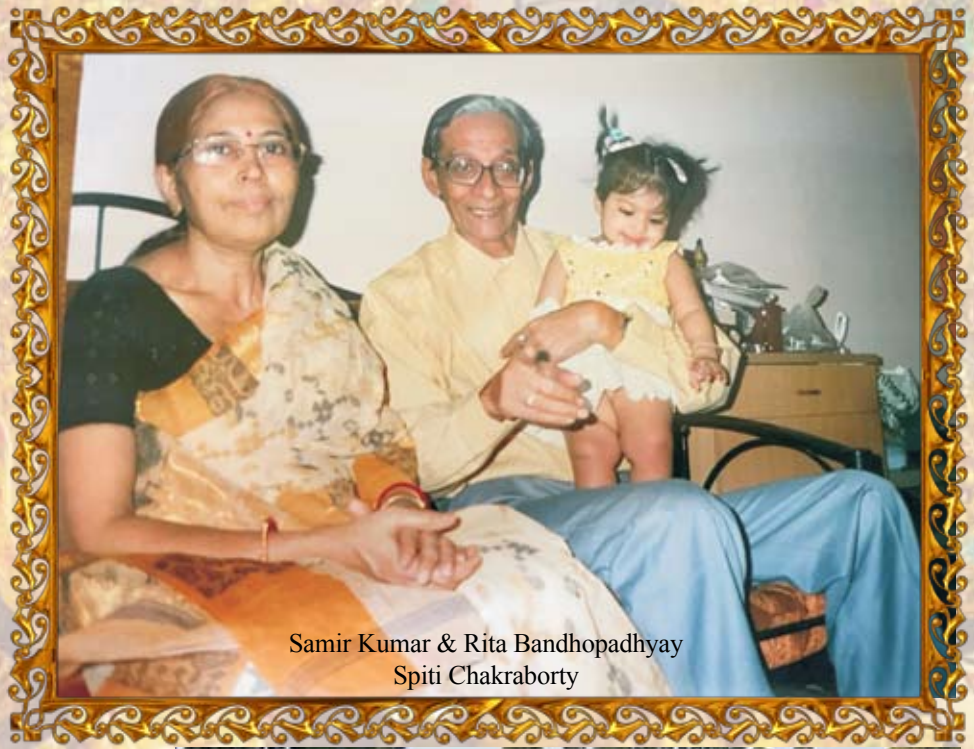

Samir Kumar & Rita Bandhopadhyay
Spiti Chakraborty

Pamela & ? Chakraborty
Spiti Chakraborty

Hirendra Bandhopadhyay

Kanaklata Debi

Buddhadeb Bandhopadhyay

Buddhadeb Bandhopadhyay

Mahadeb Bandhopadhyay
Mira Bandhopadhyay

Sujoy & Meenakshi Bandhopadhyay
Mohini Bandhopadhyay

Mahadeb Bandhopadhyay playing Tabla

Mira Bandhopadhyay

Arundeb Bandhopadhyay

Sumita Bandhopadhyay

Amitava Indrani Ahana Bandhopadhyay

Maniklal Bandhopadhyay

Shantilata Debi

Salil Kumar Roma Bandhopadhyay

Sobhan Ronika Meghna Sourav Bandhopadhyay

Sharmila Soumendra ??? Basu

Santanu Anuradha Rimika Ritwick Bandhopadhyay

Siddhartha Piyali Siddhish Sourish Samares Ava Bandhopadhyay (L to R)

Somjita Biswajit Rajashi Mukhopadhyay

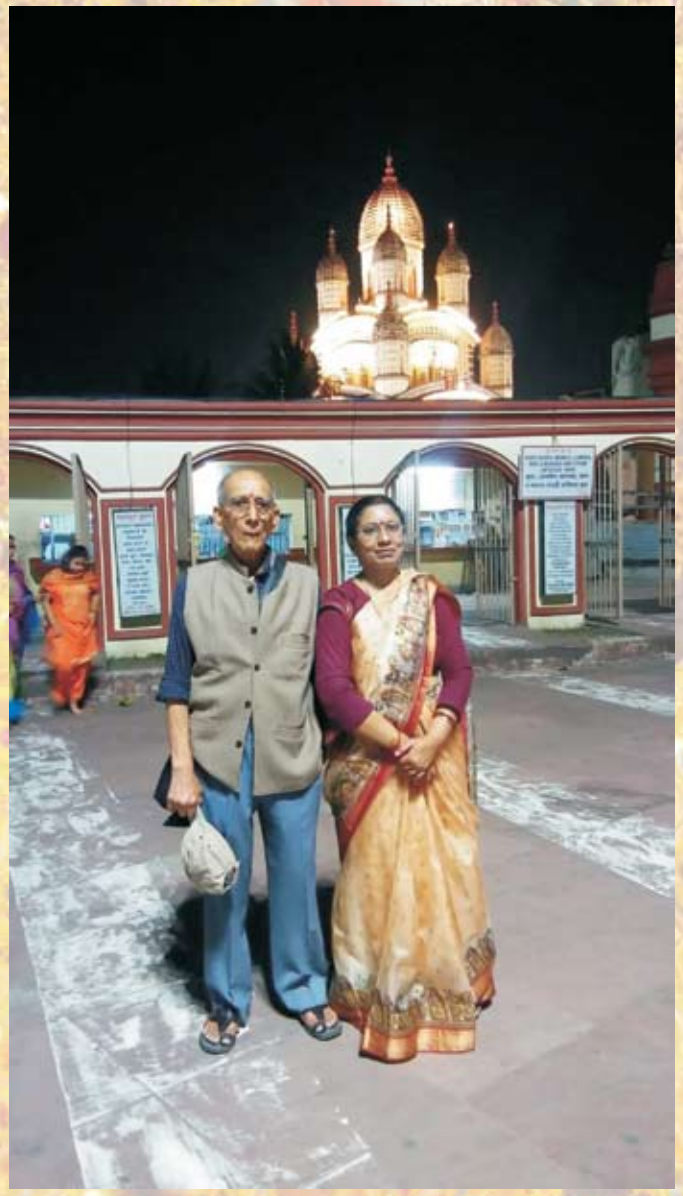

Subir Bandhopadhyay Banani Bandhopadhyay

Subabrata Bandhopadhyay Titas Bandhopadhyay

Sandip Bandhopadhyay
Krishna Bandhopadhyay

Debapriya Chakraborty Subhrajit Chakraborty
Sudeshna Chakraborty

Sumit Anasuya Soumanta Master Adwik Sarbani Srimanta Bandhopadhyay (L to R)

Mukul Kumar Bandhopadhyay Falguni Bandhopadhyay Moumita Bandhopadhyay

বিরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র (মহালয়ার কণ্ঠ)

খুশির প্রাণ

উঠনে ময়ূর

বেড়া অঞ্জলি

প্রতিমাকে গহনা পরানো ষষ্ঠীর দিন

কলা বউ স্নান

অস্ত্র পরানো

ভোগের আয়োজন

কলা বউ বরণ

ভোগের ঘর

সধবা পূজো

কুমারী পূজো

জায়ে জায়ে

ধূনো পোরানো

বাড়ির সকলে

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজিত পাঁজা

পংক্তি ভোজ

গায়ক রাম কুমার চট্টোপাধ্যায়

১০০ তম বছরের আমন্ত্রন পত্র

১২৫ তম বর্ষের আমন্ত্রন পত্র

সন্ধি পূজোর প্রস্তুতি

সন্ধি পূজো

বরণ করা

সিঁদুর খেলা

The High Court at Calcutta

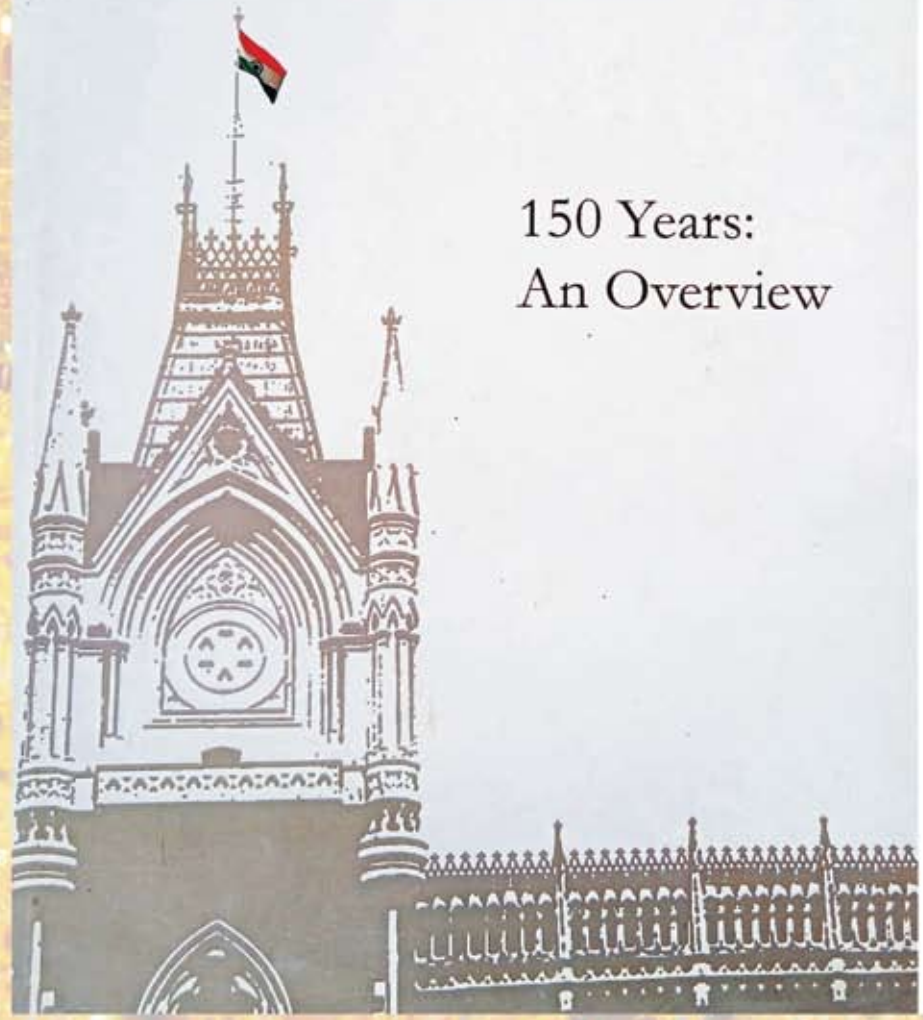

150 Years: An Overview

In England, in the year 1845 Law Society came into existence, later redesignated as Incorporated Law Society. The Colonial Calcutta Bar Library was established in the year 1825[15] followed by Attorneys' Association in the year 1851[16]. The present Incorporated Law Society was founded in the year 1908[17].

The first Bengalee Attorney Baney Madhab Banerjee[18] was born in the year 1827 at Pataldanga, the eldest son of Tarachand Banerjee, a Banian. He received his early English education in Hindu College and joined an Attorney's office in the year 1842 as an assistant and later became Head Clerk in Remfry and Co. He soon entered into Articles of Agreement with William Henry Owen on 18th October 1849 at the age of 22 years after passing the Attorney's examination on 18th July 1849. On the completion of Articleship he applied for admission as Attorney before the Hon'ble Mr. Lawrence Peel, Chief Justice in the Supreme Court of Judicature at Fort William in Bengal on 22nd November 1852. The application contained various testimonials and certificates. The following letter from Prossona Coomar Tagore is worth reproducing :

To
Baboo Baney Madhab Banerjee
My dear Sir,

In reply to your letter of yesterday I have much pleasure in stating that from the frequent acquaintances I have had of ascertaining your qualification and character for the very responsible profession you intend to embrace, I can speak with confidence that you will do credit to the same. Your success will indeed accord us infinite satisfaction and it will be an occasion of deep congratulation to our countrymen that one of them has at last broken up the monopoly and enrolled himself as a member of Attorney of Her Majesty's Supreme Court. This will be but a harbinger and I wish that the day when the Bar will be equally open to educated and respectable people from our countrymen.

Yours sincerely,
Prossona Coomar Tagore
Calcutta 2nd November, 1853.

Baney Madhab also practised as Pleader in the Sadar Dewani Adalat which is evident from the reported cases of the year 1858. As the first Bengalee Attorney he acquired sufficient fortune since he acted as attorney to two opulent estates, that of Rani Rashmoni and of the Devs of Simla. Baney Madhab did not live long and died in the year 1868. His two younger brothers, Womes and Jogendra, qualified themselves in the same profession.

The next Bengalee Attorney was Romanath Law[19] of No. 10, Gour Laha Street, Aheertola. After enrolling on 17th February 1957 he acted as partner to Swinhoe and Law, 9 Old Post Office Street, and had a considerable practice. Greesh Banerjee (1823-68)[20], father of the celebrated barrister W. C. Bonnerjee, was enrolled in the year 1859. As noted earlier, Greesh was the son of Pitumber Banerjee, Banian to Collier and Co. He served his articleship under George Rogers, later to Allan. He handled the Sobhabazar Raj family cases and amassed a large fortune in the short span of his life. Poorna Chandra Mukherjee of Janai Mukherjee family enrolled as an Attorney in the same year but for a short time he was suspended for professional misconduct. The Sen family of Colootola produced many Attorneys and Barristers. Mourali Dhar Sen (1836-79)[21], son of Ram Kamal Sen, acted as partner of Messrs Ochme and Company and later to Gray, Sen and Farr of 4 Council House Street. His nephew Narendra Nath Sen later became an Attorney.

4 CALCUTTA TIMES, THE TIMES OF INDIA
VARIETY
BHOG, ADDA & LOTS MORE
UNUSUAL CUSTOMS
PUJA ANECDOTES
PUJA 2014
REACHING OUT
'WHEN I FIRST CAME TO THIS HOUSE, THE IDOL — WHICH IS NOW MADE IN KUMARTULI — USED TO BE MADE IN OUR THAKUR DALAN. BUT WE WOMEN WEREN'T ALLOWED TO VENTURE OUT OF THE ANDARMAHAL'
— LEKHA BANDOPADHYAY
এই শহর
পুজো একনজরে...
বড়িশা শক্তিসঙ্ঘ
হাওড়া সরস্বতী ক্লাব
চণ্ডীবাড়ির পুজো
বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার
কালীঘাট ইয়ুথ
বেলগাছিয়া ভিলা

High on puja spirit Page 6

Calc

TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2014 | ADVERTORIAL, ENTER

BANDOPADHYAY BARIR PUJO

Youngsters paint the alpona on the thakur dalan; (below) devi being adorned with a gold nath

WOMAN POWER AT WORK

This family Puja has been all about stree shakti and logic since the mid-1900s

THE BANDOPADHYAYS

One of the eldest members of this family is the daughter of one of Tagore's music students. After marrying into her thakurda's mamabari, she was given the name Lekha. And as if taking her new name a tad too seriously, she rewrote several customs of the house — giving a face and voice to women, who had to, otherwise, remain in the andarmahal during Puja in the mid 1900s. "While Benimadhab Bandopadhyay, the first Bengali attorney of the Supreme Court, started Durga Puja in this house in 1890, our mother was the one who fought for stree shakti at home. She went against the norms to usher in reason. Today, Bandopadhyay Bari embraces traditions, but welcomes logic," says Sujoy Bandopadhyay — one of the organizers of the 125-year-old Puja at this Patuatola Lane mansion, better known as Mayur Bari.

PUJA 2014

WOMAN POWER

From adorning the goddess with gold jewellery on Shashthi to preparing the bhog every day from Protipod, women play a crucial role in the Bandopadhyay Barir Puja. Sujoy's wife, Meenakshi, who also happens to be a teacher, says, "The bhog is cooked by women of the family."

CONTINUED ON PAGE

৪ পূর্ব কলকাতা

আনন্দবাজার পত্রিকা

বাড়ি-ধারা

...গন্ধ এসেছে

বারোয়ারির বাইরে বাড়ির পুজোয় নানা পরিবারে নানা রীতি। কোথাও মাটির মূর্তি তো কোথাও ধাতুর। খোঁজ নিলেন বিভূতিসুন্দর ভট্টাচার্য গৌতম বসুমল্লিক

Rhythm
MUSIC + MOVIES + GAMES
WIDE RANGE OF MOBILE COVERS
ALSO AVAILABLE GIFT VOUCHERS FOR ALL SEASONS
Buy ONE Get One FREE
Buy TWO Get One FREE
Upto 50% off on Music and Movies

lakelite
FINE DINE & BAR
Festival of Biryani
LAKELITE

কলকাতার কড়চা

ভানুসিংহ

প্রথম বাঙালি

গহরজান

মুখোশ

সিলেবাসের

১৭৯১ সালে ৫৪ নং পটুয়াটোলা লেনের বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ীতে প্রথম দুর্গা পূজো শুরু; পরবর্তী সময়ে অস্কার বিজয়ী সত্যজিৎ রায় এই বাড়ীতে তাঁর ছবির সুটিং করেন

The artisans are making idol for generations

Famous Harmonium Player Shri Mantu Bandhopadhyay belonged to this family

বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ী

৯/২, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

18:05